অরুণ বলিল, পারি, যদি নিখিল ফিরে নেয়। তা বোধ হয় তোমায় সে আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ কোরবে।

অসিতা এইবার রাগিয়া উঠিল। সেও আর আঘাত না দিয়া থাকিতে পারিল না। বলিল, তুমি আগে তোমার বোন্, রাণীকে বিয়ে কর গিয়ে, তার পর সে ব্যবস্থা হবে।

অরুণ বলিল, খবরদার! মুখ সাম্‌লে কথা কও বল্‌ছি। নিখিল তোর চোদ্দ পুরুষের ভাই হয়।

আঘাত দিতে গিয়া অসিতা বড় নিষ্করুণ ভাবেই আহত হইল। অসিতা আর কোন কথা বলিল না, মৌন হইয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

আবার কিছুক্ষণ পরে অরুণ বলিল, তোমাকে এখানে আর আমি রাখ্‌তে চাই না—কালই নিয়ে যাব।

অসিতা চুপ করিয়া রহিল।

অরুণ জোরে-জোরে বলিল, শুন্‌তে পাচ্ছো?

কি?

তোমাকে এখান থেকে যেতে হবে।

বেশ, যাব।

কাল সকালেই। আমি দেশে রেখে দিয়ে তার পর কলকাতা আস্‌ব।

বেশ।

আর কথ্খনো এখানে আস্তে পাবে না।

অসিতা ধীরে-ধীরে বলিল, না পাঠালে কি আমি পালিয়ে আস্ব ?

তোমায় আমার বিশ্বাস নাই, তোমরা সবই পার।

অসিতা আর প্রতিবাদ না করিয়া পারিল না। বলিল, অবিশ্বাসের কাজটা কি দেখ্লে ?

অরুণ রাগিয়া উত্তর দিল.—কি দেখ্লে! অনেক দেখ্লুম। নিখিলের সঙ্গে কথা বল্তে বারণ করলুম, কথা কইলে। যা কোরতে বল্লুম, শুন্লে না। আরও কত-কি দেখলুম।—যেমন নচ্ছার বাপ্, তেমনি দিদি, তেমনি বোন্—আবার তেমনি একটা ছোটলোককে ঘরে পুষে রেখেছে!...আমি না হয় কিছু বল্লুম না,—বাবা, মা, শুন্লে তোমায় ঘাড় ধরে' বাড়ী থেকে দূর করে' দেবে। জান ?

অসিতা বলিল, এমন করে' আমাদের গালাগালি কি তোমার না দিলেই নয় ? আমায় একা গালাগালি দাও, মার, তোমার যা-খুসী তাই কর। কিন্তু আর সকলকে টেনে' আন্বার কি দরকার ?

একশবার দরকার আছে। এখনই হয়েছে কি ? তোমাদের সবার সাক্ষাতে কাল নিখিলকে আমি তাড়িয়ে দেব, আর তোমার বাবার কথা দেশশুদ্ধ রাষ্ট্র করব।

বাবার কথা রাষ্ট্র করে' কি কোরবে ? সে তো তোমারই অপমান,—আমায় বিয়ে করেছ যখন, তোমার শ্বশুর ত ?

সেইজন্যেই তো বল্‌ছি, ওই নিথ্‌লে' পাজিটাকে জুতো মেরে' তাড়িয়ে দেব।

ছি! তার চেয়ে তুমি বরং আমায় মেরে' ফেল। কেউ জান্‌বে না, কেউ শুন্‌বে না। তুমিও এ দায় থেকে নিষ্কৃতি পাবে। সুখে স্বচ্ছন্দে আর একটি সংসার পাতাবে।

অরুণ বলিল, আমায় আর উপদেশ দিতে হবে না। স্কুলে দুপাতা ইংরাজী পড়ে' ভেবো না, সব পুরুষের কাণ কাট্‌তে পার। আমি তাকে তাড়াব,—তোমার কি?

অসিতার আর সহ্য হইল না। বলিল, তুমি তাকে তাড়াবার কে?

কেউ নই?

না।

আমার তবে এখানে কোন অধিকার নেই?

না। একমাত্র আমার উপর।

৩৮৮` বেশ। তোমার উপরেও আর আমি কোন অধিকার রাখ্‌তে চাই না। আমি চল্লুম। বলিয়া অরুণ ধড়্‌মড়্‌ করিয়া বিছানা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। জামা জুতা পরিয়া ঘড়িতে দেখিল, পাঁচটা বাজিয়াছে। তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল। অসিতার সকল অভিমান, সকল গর্ব্ব, নিমেষেই টুটিয়া গেল। সেও বিছানা হইতে ঝাঁপাইয়া গিয়া তাহার গায়ের উপর পড়িল। বলিল, এ কি! যেয়ো না।

যাও! বলিয়া অসিতাকে ঠেলিয়া দিয়া দরজা খুলিয়া অরুণ বাহির হইয়া গেল।

সিঁড়ি পর্য্যন্ত তাহার পশ্চাতে অসিতা ছুটিয়া আসিল, কিন্তু ফিরাইতে পারিল না। সত্যিই গেলে? বলিয়া অসিতা সিঁড়ির একটা ধাপের উপর বসিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

পাশের ঘরেই সুচিত্রা শুইয়া ছিল। তাহাকে এ কথা না জানাইয়া অসিতা যেন স্বস্তি পাইতেছিল না, অথচ লজ্জাও করিতেছিল। অবশেষে প্রায় আধঘণ্টা-খানেক পরে ধীরে ধীরে তাহার রুদ্ধ দরজায় করাঘাত করিয়া সিক্ত কণ্ঠে অসিতা ডাকিল, দিদি! দিদি!

অরুণের জুতার শব্দে সুচিত্রার ঘুম ভাঙিয়াছিল, কিন্তু, হয়ত' প্রত্যূষেই তাহার কোথাও কিছু প্রয়োজন আছে, তাই শেষরাত্রে অরুণ উঠিয়া গেল ভাবিয়া সে দরজা খুলে নাই। অসিতার ডাক শুনিয়া সুচিত্রা তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিয়া দরজা খুলিয়া দিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, অরুণ নেমে' গেল, নয়? কোথায় গেল?

হ্যাঁ। বলিয়া ঘাড় নাড়িয়া অসিতা তাহার খাটের উপর গিয়া বসিতেই, সুচিত্রা তাহার পাশে বসিয়া বলিল, এত ভোরে সে তো কোনদিন যায় না,—কোথায় গেল রে?

অসিতা কোন উত্তর দিল না। সুচিত্রাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার বুকে মুখ গুঁজিয়া ডাকিল, দিদি!

সুচিত্রাও তাহার পিঠে হাত দিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, কি

ভাই ?—এঁ্যা, কাঁদচিস্ কেন অসিতা ? বলিয়া বাঁ হাত দিয়া তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিল। আদর করিয়া চুমো খাইয়া কহিল, কি হলো ভাই ? চলে গেল তাই কাঁদ্‌চিস্ ? ও জাতটাই এম্‌নি নিষ্ঠুর।

কথাটা বলিতে তাহার মাথা কাটা যাইতেছিল, তবুও অসিতা ধীরে-ধীরে বলিল, না দিদি, রাগ করে' গেল।

সুচিত্রা বলিল, আজ সকাল থেকেই তোদের ঝগড়া হচ্ছিল,—কেন, কি হয়েছে অসিতা ?

কিছু না, এম্‌নি। বলিয়া অসিতা তেম্‌নি ভাবে মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সুচিত্রা ছাড়িল না। বলিল, আমার কাছে লজ্জা করিস্ না ভাই, খুলে বল্।

অনেকক্ষণ পরে অসিতা বলিল, তুমি আমার মাথায় হাত দিয়ে বল, আর কাউকে বল্‌বে না ? বল।

সুচিত্রা বলিল কাউকে আর কে ?—নিখিল আর কাকাবাবু ত ?

হ্যাঁ। দিব্যি করে' বল যে কাউকে বল্‌বে না ?

সুচিত্রা শপথ করিল।

অসিতা বলিল, নিখিলদা এখানে আছে বলে' তার যত আক্রোশ।

জানি। বলিয়া সুচিত্রা বাহিরের খোলা জানালার দিকে স্তব্ধ নির্ব্বাকভাবে তাকাইয়া রহিল। অসিতা তাহার কোলে মাথা দিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল।

ঝড়ো হাওয়া

রাত্রির অন্ধকার শীঘ্রই কাটিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে উন্মুক্ত জানালার পথে প্রভাতের প্রথম আলোক-রশ্মি ঘরের ভিতর আসিয়া প্রবেশ করিল। গাঢ় আলিঙ্গনবদ্ধা এই দুই ভগিনীর অন্তরের অব্যক্ত বেদনা দুইজনের গণ্ড বাহিয়া অশ্রুধারায় প্রভাতালোক-বিধৌত শিশির-বিন্দুর মতই ঝল্‌মল্‌ করিয়া উঠিল।

১৩

এখন না হয় আসমানের বয়স হইয়াছে, কিন্তু রূপ বা গুণ, তাহার কম বয়সেও যে কোন দিন ছিল, একমাত্র ইন্দ্রনাথ ব্যতীত সে কথা হলফ্ করিয়াও কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু আসমানের বিশ্বাস যে, সে অফুরন্ত রূপ যৌবন লইয়া যে ব্যবসা ফাঁদিয়াছে, তাহাতে দেউলিয়া হইবার ভাবনা তাহার কোন দিন নাই। ঝি, চাকর এবং রাঁধুনীর কাজ যে-আসমানকে একদিন নিজের হাতেই করিতে হইত, এমন কি, কোন দিন অসুস্থ হইলে যাহার মুখে একফোঁটা জল দিবারও লোক ছিল না, আজ তাহারই পশ্চাতে পাঁচজন ঝি খাটিতেছে, তিনজন চাকর ছুটাছুটি করিতেছে, একটুখানি মাথা ধরিলে ইন্দ্রনাথ ভাবিয়া অস্থির হইতেছেন, —বড়-বড় ডাক্তার আসিতেছে, তাহার আবার চিন্তা কিসের? এখন সে পৃথিবীটাকে পায়ের নিচে মাড়াইয়া চলিতেও কুণ্ঠিত হয় না, কোন লোক যদি তাহার সেবা করিতে গিয়া মরিয়াও যায়, তাহা হইলেও আসমানের কোন দুঃখ হয় না। অনাহারে এবং অত্যাচারে আসমানের শরীর যখন এক সময় নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, তখন সে ভাবিত, একটু মোটা-সোটা হইলে ভাল হয়, কিন্তু এখন সে এত মোটা হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহার স্থূল শরীরটা যেখানে-সেখানে বহন করিয়া লইয়া যাইতেও তাহার কষ্টের অবধি থাকে না।

সেদিন ইন্দ্রনাথ বলিলেন, তুমি দিন-দিন যেরকম মোটা হচ্ছো আসমান, একটা ডাক্তার ডেকে' জিজ্ঞেস্ করলে হয়,—এ তোমার কোন ব্যারাম নয় ত ?

আসমান বলিয়া উঠিল, ওমা ! মিন্‌ষের কথা ত্থাখ ! ব্যারাম হবে কি গা ? আমার কি ব্যারামের শরীর ? কাঁচা বয়সে আমার চেহারা যদি একবার দেখ্‌তে তাহ'লে তোমার মুণ্ডু ঘুরে' যেতো......

মতিলাল বারান্দা দিয়া যাইতেছিল, আসমানের কথাটা শুনিয়া তাহার হাসি পাইল। একটা কিছু টিপ্পনি না কাটিয়া সে থাকিতে পারিল না ; দরজার বাহির হইতে উঁকি মারিয়া বলিল, কেন আসমান, বাবুর মুণ্ডু তো এখনও ঘোরে !...

আসমান রাগিয়া বলিল, তুই পোড়ার মুখো এখান থেকে বেরো।

মতিলাল বলিল, তোমায় তো অনেক দিন থেকেই দেখে আস্‌ছি আসমান, আমি তো আজকার নয় ! তাই বল্‌ছিলুম, তোমার সে ছেলে-বেলার রূপ, এ চেহারার মধ্যেও তো আছে !

আসমান বলিল, মতে ! তোকে তো কেউ বিচার করতে ডাকেনি, তুই এখান থেকে বেরো না ?

ইন্দ্রনাথ হো হো করিয়া হাসিতেছিলেন, মতিলাল বলিল, দেখুন, —আবার মতে' বলে' ডাকে !—ত্থাখ আসমান, এখন পায়া ভারি

হয়েছে তাই। তা নইলে চিরকাল মতিলাল বলে' ডাক্‌তে, কিন্তু মনে রেখো, এই মতিলাল গাঙ্গুলীই তোমার···

দুজনের ঝগড়া এখনই কথায়-কথায় তুমুল হইয়া উঠিবে ভাবিয়া, ইন্দ্রনাথ বলিলেন, যাও তো মতিলাল, তুমি একজন বেশ বড় ডাক্তার ডেকে নিয়ে এসো ত?

কত বড় বাবু? চার, আট, ষোলো, কুড়ি, বত্রিশ,—কত টাকার?

তোর যত খুশী।

আসমান বলিল, না, আমার জন্যে ওকে ডাক্তার ডাক্‌তে হবে না, তাহ'লে আমি দেখাব না।

ডাক্তার যে আসমানের জন্য মতিলাল তাহা জানিত না;—অবাক্ হইয়া বলিল, তোমার জন্যে ডাক্তার? কেন, কি হয়েচে তোমার? ডাক্তার দেখিয়েই তুমি বাবুকে ফতুর্ কোরবে দেখ্‌ছি।

ইন্দ্রনাথ একটা ধমক্ দিতেই মতিলাল চলিয়া গেল।

আসমান ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, মতে' ছাড়া তুমি লোক পাও না, নয়? ওকে দিয়ে তোমার ডাক্তার ডাকবার কি দরকার?—বাবা রে বাবা! মরণ হলেই বাঁচি। শেষকালে আমার কপালে কি না এ-ও ছিল! মতে, হারামজাদা, এই রাস্তার কুকুর, সেও কি-না আমার মুখে নাথি মারে! বলিতে বলিতে আসমানের গোলাকার চক্ষু দুইটা অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল।

ইন্দ্রনাথ মহা শশব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, আ হা হা হা, কি

হলো কি? তুমিও যেমন! ওটা পাগল, পাগল, আস্ত পাগল! আমাকেও তো সে বল্‌তে ছাড়ে না।

তোমার পিয়ারের লোক,—তোমায় সে বল্‌তে পারে। তাই বলে' আমায় বলবার কে? আমার ঘরেই থাক্‌বে, আবার আমাকেই কি-না…ওরে আমার কে রে!

ইন্দ্রনাথ একটুখানি অনুনয়ের সুরে বলিলেন, তোমার সঙ্গে তার অনেক দিনের ভাব,—সেই সুবাদেই বলে, তা নইলে কি সে বল্‌তে পারতো?

ভাব কিসের, শুনি? সে ছিল ত' ছিল,—কোন্ জন্মে ছিল তার ঠিক নেই। তাই বলে' এখন তার কি বটে?—ডাক্তার আমি দেখাব না, তুমি দেখাও গে যাও। বলিয়া আসমান অতি কষ্টে ধীরে ধীরে সেখান হইতে উঠিল এবং পাশেই শোবার ঘরের খাটের উপর আপাদমস্তক ঢাকা দিয়া শুইয়া পড়িল।

এখনই ডাক্তার আসিবেন, অথচ রোগী রাগ করিয়া শুইল দেখিয়া ইন্দ্রনাথ বিচলিত হইয়া উঠিলেন। অনেক কষ্টে হাতে পায়ে ধরিয়া তাহার রাগ ভাঙাইয়া বলিলেন, আর যদি মতিলাল তাহাকে কোন দিন কোন কথা বলে, তাহা হইলে তিনি তাহাকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিবেন।

ডাক্তার আসিলেন। বড়লোকের বড়-রোগী দেখিয়া একটুখানি খুশী হইয়াই ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং সঙ্গে-সঙ্গে এ-কথাও

রহিল, পরে ঈষৎ হাসিয়া কহিল, হ্যাঁরে অরুণ, বিয়ে কোরবি? একটি সুন্দরী মেয়ে আছে।

অরুণও হাসিতে হাসিতে কহিল, চাকরী ছেড়ে এবার ঘট্‌কালি আরম্ভ করেচিস্ না কি?

নিখিল এইবার গম্ভীর ভাবে বলিল. না, হাসি নয় অরুণ, বল্, বিয়ে কর্‌বি কি না।

তুই নিজেও তো কোর্‌তে পারিস্।

আমার কথা ছেড়ে দে, তুই আগে বল্।

ভাল মেয়ে হইলে বিবাহে অরুণের সম্পূর্ণ সম্মতি ছিল, কিন্তু মুখে বলিল, না, আমি এখন বিয়ে কোরব না।

এমন মেয়ে কিন্তু আর পাবি না। বলিয়া নিখিল একটুখানি চিন্তিত হইয়া পড়িল।

তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া অরুণ কহিল, মেয়ে তুই নিজের চোখে দেখেচিস্ নিখিল? কার মেয়ে?

হ্যাঁ দেখেচি বই-কি, তোকে না দেখেই বল্‌চি? আমার অফিসে এক ভদ্রলোক কাজ করেন, তাঁরই ভাই-ঝি। ব্রাহ্মণ বড় বিপদে পড়েচেন।

অরুণ বলিল, আমি তো নিজে কিছু বল্‌তে পারিনে নিখিল, তুই তো সব জানিস্,—বাবা রয়েচেন—

নিখিল এইবার একটুখানি আনন্দিত হইয়া বলিল, সে ভাবনা

বলিলেন যে, যদি এই অসময়ে তাঁহাকে না ডাকা হইত এবং রোগী যদি পূর্ব্বের মত আরও কিছুদিন রীতিমত আহারাদি করিতেন, তাহা হইলে চর্ব্বি বাড়িয়া তিনি হঠাৎ কোন্ দিন মরিয়া যাইতেন।

ডাক্তার চলিয়া গেলে ইন্দ্রনাথ বলিলেন, দেখ্‌লে? আমি ঠিক ধরেছি। ইস্! চর্ব্বি বেড়ে' কোন্ দিন·· না, না, ওসব চল্‌বে না। ওগো শোন, শোন, এখন বেশ নিয়মিতভাবে ওষুধপত্র খাও, আর না হয় চেঞ্জে (change) থেকেই আর একবার ঘুরে' আসি চল।

মতিলাল ডাক্তারকে সিঁড়িতে নামাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, ইন্দ্রনাথ তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, শুন্‌লি মতিলাল, তুই তো বলে দিলি ডাক্তার কি জন্যে! এদিকে শুনেচিস্ কি বলে গেল?

মতিলাল বলিল, হুঁ, শুন্‌লুম তো বাবু! ওর মতন রাজভোগ পেলে আমরাও এই শুক্‌নো হাড়গুলো পর্য্যন্ত ফুলে' উঠ্‌তো। তাহ'লে এবার থেকে খাওয়া একটু কমিয়ে দাও আসমান! আরে বাপু, হঠাৎ কপাল গুণে বড়লোকের হাতে পড়লেই কি আর এক ডেলা করে' সোণা খেতে হয়! চিরকাল যেমন খাওয়া অভ্যেস্, লোকে সচরাচর যেমন খায়, তেম্‌নি খা না রে' বাপু, তা নয় উনি আরম্ভ করলেন, দিনের মাথায় পাঁচ গ্লাস করে' বেদানার রস, দশ গ্লাস করে আঙুরের রস......এদিকে বাবুর নিজের যারা-সব, তারা এত দিন না খেতে পেয়ে মরেই গেল কি না কে জানে?···

আস্‌মান চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, স্থাখ্ মতে', হারামজাদা

ভিকিরি বামুন কোথাকার, তুই যদি ফের্ বুকে বসে' দাড়ি উপ্‌ড়োবি, তাহ'লে চাকর হাতিয়ে তোকে দূর করে' দেব, জানিস? আমি কাউকে এক পয়সা;—একটা কানা কড়ি দিতে দেব না, দেব না, দেব না,—এসব কারো নয়। ঘর, বাড়ী, বিষয়, সম্পত্তি, সব আমার, তার খবর রাখিস্ হতভাগা?

মতিলাল অনেকগুলা গালাগালি খাইয়া সত্যই এবার রাগিয়া উঠিয়াছিল। বলিল, খবর খুব রাখি। এই মতিলাল গাঙ্গুলী তোমাদের খবর রাখ্‌তে গিয়েই তো নিজের সর্ব্বনাশ করেছে। তবে এই বাবুর কাছেই আজ রফা হয়ে যাক্। বলিয়া মতিলাল ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া ইন্দ্রনাথের সুমুখে বসিয়া বলিল, দেখুন বাবু, শুনুন! আপনারা সবই জানেন, তাহ'লেও আর-একবার বলি। আজ না হয় ভিখিরী বামুন হয়েছি, পথের কুকুর হয়েছি, কিন্তু করেছ ত' তোমরাই। বলিয়া সে একবার আসমানের দিকে কট্‌মট্ করিয়া তাকাইল, তাহার পর আবার বলিতে লাগিল, ধরুন, বাবা মরে পেলুম, নগদ পাঁচহাজার টাকা; আর মা মরে গেলে তার হাজার খানেক টাকার গয়না নিয়ে পালিয়ে এলুম কলকাতায়। ইচ্ছা ছিল, একটা দোকান-টোকান করে' যাহোক্ নিশ্চিন্তি হয়ে বসা যাবে, কিন্তু বদ-অভ্যেস জানেনই তো;—ছেলে বেলা থেকে। সেই দু' হাজার টাকা, দোহাই ধর্ম্ম, আপনার পায়ে হাত দিয়ে বল্‌ছি বাবু, একটি পয়সা নিজে খরচ করলুম না, সব ঢেলে দিলুম এই আস্‌মানের দিদিকে—'ও তখন ছেলে মানুষ। বাস্!

বছর খানেক পেরোতে না পেরোতেই ফর্‌সা,—ওর দিদি গেল মরে', আর সে টাকাগুলোও এলো এই আসমানের হাতে। এখন বলুন ত' বাবু বিচার করে'—এই আসমানের ঘরেই খাওয়া-পরা আমার হকের পাওনা কি না! চাকর হাতিয়ে দূর করে' কি দিলেই হলো ?...

আসমান বলিল, হ্যাঁ, খাবি ?

আল্‌বাৎ খাব। বলিয়া মতিলাল তাহার শীর্ণ হাতখানা মেঝের উপর সজোরে চাপড়াইয়া দিল।

১৪

বিবাহের বৎসর ফিরিতে না ফিরিতেই দ্বিরাগমনের ঘটা না করিয়া, এমন কি একটা ভাল দিন পর্য্যন্ত না দেখিয়াই উমেশ মুখুজ্যে, তাঁহার নূতন বধূমাতাকে কলিকাতা হইতে কেন যে লইয়া আসিলেন, এই লইয়া গ্রামের মধ্যে বেশ একটা সাড়া পড়িয়া গেল। মেয়ে যে লেখা-পড়া জানে এবং তাহার বয়স, সাধারণ বিবাহযোগ্যা মেয়েদের চেয়ে যে অনেক বেশী, এ কথাটা বিবাহের সময়েই সকলের কাণে-কাণে গ্রামের আবাল বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই শুনিয়াছিল এবং তজ্জন্য তাহারা নিঃসংশয়ে ইহাও ধারণা করিয়া লইতে ভুলে নাই যে, অরুণ কলেজে পড়ে, বোধ করি বা কোনও বিধবা কিংবা বয়স্কা মেয়ের সহিত পূর্ব্বরাগ ঘটিয়া যাওয়ায় এ কাণ্ডটা করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার পর, এখন অকস্মাৎ সেই বৌকেই এমন করিয়া লইয়া আসায় তাহাদের বিশ্বাস আরও বদ্ধ-মূল হইয়া গেল, কিন্তু হইলে কি হয়, গ্রামের মধ্যে পয়সাওয়ালা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী উমেশ মুখুজ্যের বিরুদ্ধে ইচ্ছা থাকিলেও কোন কিছু আন্দোলন করিতে কেহ সাহস করিল না।

পাড়া-পড়্শী সকল বয়সের এবং সকল রকম মেয়েরা, কেহ বা বৌকে আর একবার দেখিবার জন্য, কেহ বা কৌশলে গোপন তথ্য সংগ্রহ করিবার আশায় উমেশ মুখুজ্যের বাড়ীতে জড় হইতে লাগিল।

ক্ষীরোদা সুন্দরী বলিলেন, কি জানি মা, ছেলেতে বাপে পরামর্শ করে' বৌ আন্‌লেন, আমায় কি আর কেউ গেরাহ্যি' করে, না এক কথা শুধোয়…। আবার কাহাকেও বলিলেন, বৌএর বয়স হয়েচে যে মা, কতকাল বাপের বাড়ীতে রাখি বল? আমাদের গেরস্থ ঘরের বৌ শ্বশুরবাড়ীতে থেকে কাজকর্ম্ম যত শেখে তত ভালো।

এবং যাঁহারা নিতান্ত আত্মীয় তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমার রাণীরও ত' বিয়ে-থা দিতে হবে এবার, তাই বলি, বৌ এসে' আপনার কাজকর্ম্ম দেখে' নিক্ মা! আর একা এই সংসারের জন্যে খেটে খেটে ওই একরত্তি মেয়ের আমার গতরটা যে গেল,—বৌ এলো, এবার তাহ'লেও দুদণ্ড সে জিরোতে অবসর পাবে।

কিন্তু আসল কথাটা সকলের নিকট গোপন রহিয়াই গেল।

ও-পাড়ার ঘোষাল গিন্নি অরুণের বিবাহের সময় তাঁহার এক বোন্‌-ঝির বিবাহোপলক্ষে বাপের বাড়ী গিয়াছিলেন, কাজেই এই নূতন বৌটিকে দেখিবার সুযোগ তাঁহার সে সময় হয় নাই।—বৈকালে তিনি তাঁহার তিনটি ছোট বড় মেয়েকে সঙ্গে লইয়া বৌ দেখিতে আসিলেন। অসিতাকে ভাল করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া বলিলেন, এ যে বেশ বৌ ক্ষীরু,—যেমন নাক-চোখ ডাগর-ডাগর, তেমনি হাত পায়ের গড়ন! আবার দশজনের মুখে শুনছি না কি বৌ লেখাপড়াও জানে!

ক্ষীরোদাসুন্দরী কহিলেন, সবই তো ভাল দিদি, এইবার গুণ ভাল হয় তবে ত! শিমুল ফুলের মতন রূপ নিয়ে তো কিছু হয় না ভাই!

না, গুণ আছে বৈ কি। বলিয়া ঘোষাল-গিন্নি অসিতাকে বার কয়েক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, মনে হচ্ছে, আমাদের অরুণের সঙ্গে যেন একটুকু বে-মানান্ হলো এত বড়টি যেন না হলেই ভাল হতো। না, কি বল্ ক্ষীরু ?

তা সত্যি বল্‌তে কি দিদি, আমার বড় সাধ ছিল বৌমা আমার বেশ ছোট-খাট হবে, বেশ কোলে করে ঘরে আন্‌ব ; কিন্তু সে আর হলো কই ভাই ? রানুর সম-বয়েসী হলেই বেশ ভাল হতো—দুটিতে মিলে মিশে থাক্‌তো।

ঘোষাল-গিন্নির ছোট মেয়েটি মায়ের গলা জড়াইয়া তাঁহার কাণে-কাণে কি যেন বলিল। ঘোষাল গিন্নি বলিলেন, ওই ছাখ্ ভাই, মেয়েটা আমায় ও-বেলা থেকে জ্বালাতন করে' মার্‌লে! খালি বল্‌চে, চল্ মা, ও-পাড়ার মুখুজ্যেদের বৌ এসেছে, সন্দেশ খেয়ে আসি। তাহার পর তিনি মেয়েটার দিকে কৃত্রিম রোষ কটাক্ষ হানিয়া একটা ধমক্ দিয়া কহিলেন, সন্দেশ কোথায় পাবি মা! বৌ কি আর দ্বিরাগমনে এসেচে যে, তোর জন্যে সন্দেশ আন্‌বে ? চুপ কর্! চেঁচাস্ নে। বৌ কেমন কাপড় পরেছে ছাখ্। বলিয়া তিনি অসিতার শাড়ীখানার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

মেয়েটার কিন্তু শাড়ী দেখার আগ্রহ মোটেই ছিল না, মায়ের কোলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া এইবার সে কাঁদিবার উপক্রম করিল।

ক্ষীরোদা সুন্দরী বলিলেন, আর বলো না ঘোষাল-গিন্নি, লজ্জায়

আমার আর মুখ দেখাবার ঠাঁই নেই। কলকাতা থেকে আস্‌ছে, সন্দেশের কথা না হয় ছেড়েই দাও, আঁচলের খুঁটে দুটো শুক্নো বাতাসাও তো বেঁধে দিতে হয়! আবাগীর বেটীরা কি জানে ছাই! শহরের ধিঙ্গি মেয়ে শুধু ফষ্টি-নষ্টি কোরতেই জানে।

ঘোষাল গিন্নি অবাক্ হইয়া গালে হাত দিয়া বসিলেন। বলিলেন, সে কি কথা ক্ষীরু,—সঙ্গে সন্দেশের একটা হাঁড়িও ছায় নি? বলি, আমাদের দু'দশটা ছেলে-পুলে আছে,—আমরা আঁটকুড়ি নই মা, সে কথা কি তোমার বাবা-মা জানে না বৌ? বলিয়া তিনি অসিতার মুখের পানে তাকাইলেন।

অসিতা হেঁটমুখে বসিয়াছিল; ঘোষাল-গিন্নির দিকে সকরুণদৃষ্টিতে একবার তাকাইয়া ধীর-নম্রকণ্ঠে কহিল, আমার মা নেই।

কিন্তু সেই বেদনা-পরিম্লান দুটি স্নিগ্ধ-সকরুণ কথার অন্তরালে করুণাকাঙ্ক্ষী যে নারীহৃদয় অব্যক্ত বেদনায় চঞ্চল হইয়া উঠিল, সেদিকে কাহারও দৃষ্টি পড়িল না। ঘোষাল গৃহিণীর জিহ্বাগ্রভাগ হইতে আবার অনেকখানি বিষ ঝরিয়া পড়িল। তিনি বলিলেন, মা তো আর সবাইকার থাকে না বৌ। বাবা তো মরেনি? দু'চারটা বোনও তো আছে?

অসিতা ধীরে-ধীরে বলিল, আমার দিদি তো দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু উনি যে রাগারাগি করে...

তাহাকে কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই ক্ষীরোদা তাহার মুখের

নিকট হাত নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, এইটি তুমি মিছে কথা বল্‌চো মা,—আচ্ছা, তুমিই বল ত' দিদি, আমার অরুণের রাগ তোমরা কোন দিন দেখেছ, না, কেউ কখনও শুনেচো ?

ঘোষাল গিন্নি তাঁহার নেত্রযুগল ঈষৎ বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন, ও মা! ও কি তাই বল্‌ছে নাকি ক্ষীরু ? কি বলে, অরুণ রাগারাগি করে বৌ নিয়ে এসেছে ? হাজার অপমান কর্‌লে যার মুখ দিয়ে একটা কথা বেরোয় না, সে কর্‌বে রাগারাগি ? আর, বেটাছেলে, যদিই তাই করে থাকে, তাহ'লে তোমার দোষ-ঘাট হয়েছে নিশ্চয়।

ক্ষীরোদা সুন্দরী বলিলেন, আমিও তাই বলছিলুম দিদি, অরুণ যাই করুক্ আর তাই করুক্, তুমি বৌ ঝি মানুষ, সে কথা মুখ দিয়ে কেমন করে বার কোরছ বাছা! তা ও-আবাগীর বেটীর কি ঘেন্না-পিত্তি লজ্জা শরম আছে যে চুপ করে' থাক্‌বে।

এই নির্ম্মম বাক্যবাণগুলা অসিতার সর্ব্বাঙ্গে বড় নিষ্ঠুরভাবেই বিদ্ধ হইতে লাগিল; কিন্তু যন্ত্রণা প্রকাশ করা দূরে থাকুক্, মুখখানা পর্য্যন্ত বিকৃত করিবার উপায় তাহার নাই,—এমনি নিস্তেজ নির্ব্বিষ অবস্থায় জগতের সর্ব্বপ্রকার কঠোর আঘাত মুখ বুজিয়া তাহাকে আজীবন সহ্য করিতে হইবে বলিয়াই সে এখানে আসিয়াছে,—তুঁষের আগুনে তাহাকে আস্তে-আস্তে পুড়িয়া মরিতে হইবে বলিয়াই বিবাহিত জীবনে তাহার এই সর্ব্বনাশা বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে।

বাহিরে রাণীর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাওয়া গেল। দুপুরে আহারাদির

পর সে বাহির হইয়া গিয়াছিল, এতক্ষণ পরে তাহার সমবয়সী পাঁচ ছয় জন মেয়েকে সঙ্গে লইয়া হুড়মুড় করিয়া ঘরে ঢুকিয়া ক্ষীরোদাসুন্দরীকে বলিল, যাও মা, এবার তোমরা বাইরে যাও, ও-ঘরে গিয়ে বসো—আমরা বৌ দেখি।

তাই ত্যাখ্ মা। বলিয়া ঘোষাল-গিন্নিকে লইয়া ক্ষীরোদা বাহির হইয়া গেলেন।

মেয়েরা তখন অসিতাকে ঘিরিয়া বসিয়াছে। ইহাদেরই দু'তিন জনকে অসিতা বিবাহের সময় দেখিয়া গিয়াছিল। তাহাদের মুখের চেহারাগুলা এখন আর ঠিকমত স্মরণ না থাকিলেও, তাহাদের চড়, চিমৃটি এবং কথা-বার্তার অশ্লীলতা বোধ করি মরণের দিন পর্য্যন্তও তাহার স্মরণে থাকিবে।

অসিতার একখানা হাত টানিয়া ধরিয়া রাণী বলিল, বৌ, তুমি একবার উঠে দাঁড়াও ত? বলিয়া তাহাকে চড়্ চড়্ করিয়া টানিয়া তুলিয়া দিল।

অসিতা বলিল, কেন? কি হবে ভাই?

রাণী সে কথায় ভ্রুক্ষেপ না করিয়া তাহার সঙ্গীদের মধ্যে একজনকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, উঠে আয় না লো পরী,—লজ্জা কি তোর? তখন যে বল্‌ছিলি, বৌ তোর চেয়ে লম্বায় ছোট। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছাথ না এসে?

কিন্তু পরী উঠিয়া আসিলে রাণী হার মানিল। অসিতা সত্যই ছোট হইল।

রাণী কিন্তু সহজে হটিবার পাত্রী নয়। বলিল, না ভাই পরী, তুই সোজা হয়ে দাঁড়াস্ নি।—আর কতই বা ছোট, এই চার আঙুল বই তো নয়! বলিয়া রাণী তাহার ডান হাতের আঙুল দিয়া মাপিয়া দেখাইয়া দিল।

অসিতা কিছুই ভাবিতে পারিতেছিল না,—এই একটা দিনের মধ্যে সে কেমন যেন এক রকম হইয়া গেছে! মূল্যবান ভাবিয়া এতদিন সে তাহার মনের ভাণ্ডারে যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছে, আজ এই কাজে লাগিবার মুহূর্ত্তে সযত্ন আহরিত তাহার সেই বস্তুগুলিকে চোখের সুমুখে এমন ভাবে নিষ্ফল ব্যর্থ হইয়া যাইতে দেখিয়া, অসিতা কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ের মত সকলের দিকেই নিরর্থক ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল—তাহার যেন কিছু জানিবার নাই, বলিবার নাই, দিবারও নাই, গ্রহণ করিবারও নাই! আদান-প্রদানের হাটের মাঝে সে যেন হঠাৎ দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছে!

একটি মেয়ে অনেকক্ষণ ধরিয়া অসিতার শাড়ীর পানে তাকাইতে-ছিল, হঠাৎ সে ধীরে-ধীরে বলিয়া উঠিল, হ্যাঁ ভাই, কেমন করে' পরেছ শাড়ীটা? আমায় শিখিয়ে দেবে?

কেন দেব না ভাই? এসো। বলিয়া অসিতা তাহাকে দেখাইয়া দিবার জন্য অগ্রসর হইল।

রাণী তাড়াতাড়ি মেয়েটিকে টানিয়া ধরিয়া বলিল, ছি সুরো,

তোর নয়,—সে আমি যেমন করে' পারি দেখে নেব। তোর মত আছে ত?

কিন্তু মেয়েটি একবার—

নিখিল বলিল, দেখ্‌তে চাস্‌? কাল তোর সময় আছে? আমার সঙ্গে যেতে পার্‌বি?

না, রবিবার দিন।

বেশ, রবিবার সকালে তুই আমার কাছে আসিস্‌ যেন। দুজনে যাব।—তাহ'লে আজই তোর বাবাকে একখানা চিঠি লিখে দি?

সে তোর খুশী।

ও রকম করে ঘেম্‌টাওয়ালীরা কাপড় পরে,—তুই ভদ্রঘরের মেয়ে, তুই পরবি কি না ?

অসিতা একবার চমকিয়া উঠিয়া চুপ করিয়া বসিয়া পড়িল।

রাণী আবার বলিল, বৌ আমাদের নাচ্‌তে জানে, তুই পার্‌বি ?

সে মেয়েটি কোন উত্তর করিল না, বোধ করি অসিতার ব্যথা সে বুঝিতে পারিয়াছিল।

পরী বলিল, সত্যি না কি ভাই ? তা হ'লে বল্‌, গাইতেও জানে, বাজাতেও জানে······

রাণী জোর করিয়া বলিল, হ্যাঁ, ওকেই না হয় জিজ্ঞেস কর্‌।

অসিতার শাড়ীর আঁচলে খুব জোরে একটা হেঁচ্‌কা টান দিয়া পরী জিজ্ঞাসা করিল, সত্যি নাকি বৌ ?

কয়েকবার ঘন-ঘন ঘাড় নাড়িয়া অসিতা বলিল, হ্যাঁ। এবং সেই শিরশ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পদাঙ্গুষ্ঠ হইতে কেশাগ্রভাগ পর্য্যন্ত থর্‌-থর্‌ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

১৫

আসমানকে লইয়া ইন্দ্রনাথ পুনরায় পুরী চলিয়া গেলেন। এবার আর মতিলাল তাহাদের সঙ্গে গেল না,—জন-কতক বেহারা লইয়া সে পার্ক ষ্ট্রীটের বাড়ীতেই রহিল।

প্রায় প্রতি সপ্তাহেই তাঁহাদের ভাল থাকার সংবাদ দিয়া ইন্দ্রনাথ মতিলালকে একখানা করিয়া চিঠি লিখিতেন। গত সপ্তাহের চিঠিতে তিনি লিখিয়াছিলেন, আসমানের অসুখ বাড়িয়াছে,—কি যে হইবে কে জানে। তাহার পর আর কোন সংবাদ না পাইয়া মতিলাল অত্যন্ত বিচলিত এবং চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। সে ভাবিতেছিল, চিঠির অপেক্ষায় আর দিন-দুই কাটাইবে, পরে একখানা টেলিগ্রাম করিয়া দিবে।

কিন্তু টেলিগ্রাম তাহাকে করিতে হইল না। সেদিন বৈকালে খানিকটা মদ গিলিয়া মতিলাল কথা কহিবার সঙ্গী পাইতেছিল না,—অবশেষে একটা চাকরকে ডাকিয়া সে তাহাকে কতকগুলা হিতোপদেশ দিতে আরম্ভ করিল। বলিল, স্থাখ্ পাঁচু, নিজের ভালো যদি কোনদিন চাস্ ত' মেয়েদের বিশ্বাস করিস না। তারা নিজের কাছেই নিজেকে গোপন করে। আর পুরুষদের তিলে-তিলে পুড়িয়ে মারে।

চাকরটা মনোযোগের সহিত তাহার কথাগুলা শুনিতেছিল; এবং

এমন একজন মর্ম্মগ্রাহী শ্রোতা মিলিয়াছে ভাবিয়া, মতিলালও তাহার সহিত অনর্গল চীৎকার করিতে সুরু করিয়া দিল। কিন্তু তাহার আজিকার কথায়-বার্ত্তায় এত করিয়া নারী-বিদ্বেষ কেন যে ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহা সে নিজেই ঠাহর করিতে পারিতেছিল না।

এমন সময় সম্মুখের প্রাঙ্গণের উপর ইন্দ্রনাথের গলার আওয়াজ পাইতেই মতিলালের মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। চাকরটার সহিত সে-ও ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়াই দেখিল, একখানা ট্যাক্সি-মোটর হইতে ইন্দ্রনাথ নামিয়া তাহাদেরই নাম ধরিয়া ডাকাডাকি করিতেছেন। হঠাৎ কোন চিঠি নাই, এমন অকস্মাৎ বাবু যে একাকী ফিরিয়া আসিবেন, সে কথা কেহ ভুলিয়াও ভাবে নাই। তাঁহার সঙ্গে আসমানকে দেখিতে না পাইয়া মতিলাল যেন আরও বেশী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়িল। জিজ্ঞাসা করিল, আপনি একা চলে এলেন যে বাবু?

হ্যাঁ এলুম। বলিয়া গাড়ী হইতে জিনিসপত্র নামাইবার হুকুম দিয়া ইন্দ্রনাথ উপরে উঠিয়া গেলেন।

মতিলাল সিঁড়ির নিচে হইতে বলিল, আসমান কেমন আছে বাবু? তার অসুখ?

কিন্তু ইন্দ্রনাথের নিকট হইতে কোন জওয়াব পাওয়া গেল না,—তিনি তখন উপরে উঠিয়া গেছেন।

তাঁহার মুখ-চোখের মলিন ভাবভঙ্গি মতিলালের বেশ ভাল বলিয়া

বোধ হইল না। গাড়ী হইতে জিনিসপত্র নামাইবার ভার চাকরদের উপর দিয়া, সেও তাঁহার পশ্চাতে সিঁড়ি ধরিয়া উপরে উঠিতে লাগিল।

ইন্দ্রনাথ হাতমুখ ধুইলেন না, কাপড় জামা ছাড়িলেন না,—তাঁহার বসিবার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া একটা মোটা তাকিয়ায় হেলান্ দিয়া হাত-পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িলেন। সন্ধ্যা প্রায় ঘনাইয়া আসিয়াছিল। মতিলাল দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিল; এবং কিয়ৎক্ষণ পরে ধীরে-ধীরে ঘরে ঢুকিয়া, আলোর সুইচ্‌টা টিপিয়া দিয়া, ইন্দ্রনাথের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, অমন করছেন যে বাবু? কি হলো আপনার?

ব্যথিত কণ্ঠে ইন্দ্রনাথ কহিলেন, হয়নি কিছু মতিলাল,—ব'স্!

মতিলাল বসিল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ইন্দ্রনাথ কহিলেন, আমার চিঠি পেয়েছিলি? আসমানের অসুখ···

হ্যাঁ। সে কেমন আছে বাবু?

ইন্দ্রনাথ উদাস করুণ দৃষ্টিতে মতিলালের মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, সে আছে কোথায় মতিলাল,—পরশু রাত্রে সে হঠাৎ মারা গেল।···

ইন্দ্রনাথ আর কিছু বলিতে পারিলেন না। মতিলালও একবার চমকিয়া উঠিয়া বলিল, মারা গেল? এত টাকা খরচ করেও বাঁচাতে পারলেন না?

না।

কিছুক্ষণ উভয়েই চুপ করিয়া রহিল।

মতিলাল প্রথমে কথা কহিল। বলিল, যাক্, সেজন্যে অত ভাববেন না বাবু, দেখে শুনে আর একটা জোগাড় করে' নিতেই বা কতক্ষণ?

ইন্দ্রনাথ বলিলেন, আর না মতিলাল, খুব হয়েছে।

মতিলাল কহিল,...তাও ভালো।

এমন সময় একজন ভৃত্য আসিয়া দরজার পর্দা সরাইয়া বলিল, রাত্রে বাবু কি খাবেন...

মতিলাল বলিল, চিরকাল যা খান, তাই খাবেন।

ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, ওরা সব এসে' পৌঁছেছে?

মতিলাল কহিল, কে, আস্‌বে কে?

ঝি, চাকর,—যারা সঙ্গে গিয়েছিল!

ভৃত্য কহিল, আজ্ঞে হ্যাঁ। অনেকক্ষণ তারা এসেছে। বলিয়া সে চলিয়া গেল।

ইন্দ্রনাথ বলিলেন, কাল সকালেই তোকে একটি কাজ করতে হবে মতিলাল,—এতগুলো ঝি-চাকর নিয়ে আর কি কোরব? মাইনে দিয়ে কাল কতক্‌গুলো বিদেয় করে' দিস্‌।

মতিলাল বলিল, আর আমি? আমিই বা আর কি জন্যে ..

তুই আর যাবি কোথায় মতিলাল?—তুই থাক্।

মতিলাল বলিল, আপনি উঠুন বাবু, মুখ হাত ধুয়ে কাপড় জামা ছেড়ে' বসুন। যে বিশ্রী চেহারা হয়েছে...

হ্যাঁ, যাই। বলিয়া ইন্দ্রনাথ উঠিলেন। মতিলালও নিচে নামিয়া যাইতেছিল। ইন্দ্রনাথ বলিলেন, তুই নিচে যাচ্ছিস্? বলে দে, আমি আজ রাত্রে কিছু খাব না।

কেন? কি হয়েছে আপনার?

হয়নি কিছু। খাবার তেমন ইচ্ছে নেই।

সে আপনার কে ছিল বাবু? তার জন্তে উপোস করে' মরবার ত' কোনও প্রয়োজন দেখি নে। বলিয়া মতিলাল নিচে নামিয়া গেল।

নিচে তখন ঝি-চাকরদের মধ্যে তর্কবিতর্ক ভয়ানক উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। কেহ বলিতেছে, গিন্নি-মার স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে, ভালোই হইয়াছে!...কেহ বলিতেছে, জগন্নাথ-ধামে মৃত্যু হইয়াছে, বেটি যাই করুক্, তাহার পুণ্য ছিল।...আবার কেহ-কেহ পরস্পরকে সাবধান দিয়া বলিতেছে, চুপ কর্ হতভাগারা, বাবু শুন্‌তে পেলে' সবাইকে দূর করে' দেবেন।

তাহাদের গিন্নি-মা কেমন করিয়া মরিল, শ্মশানে লইয়া যাইবার জন্ত কতগুলা বলিষ্ঠ লোকের প্রয়োজন হইয়াছিল; মরিবার সময় তাহার ভাঁটার মত চোখদুইটা বুজিয়াছিল না চাহিয়াছিল, দাঁতগুলা বাহির হইয়া পড়িয়াছিল কি-না, ইত্যাকার সম্ভব-অসম্ভব এবং আবশ্যক-অনাবশ্যক

প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে, পুরী হইতে সদ্য-প্রত্যাগত দাস-দাসী কয়েক-জন একেবারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

মতিলাল তাহার নিজের ঘরে গিয়া চুপ করিয়া বসিল। আসমানের এই আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদ তাহার মনেও কম আঘাত দেয় নাই। নারীর প্রতি যে বিদ্বেষ কিছুদিন হইতে তাহার দেহ মনে ব্যাপ্ত হইয়া উঠিতেছিল এবং আজিকার অপরাহ্নেও ভৃত্য পাঁচুকে যে সম্বন্ধে উপদেশ দিতে সে কুণ্ঠিত হয় নাই, এতক্ষণ পরে সেই বিদ্বেষের বহ্নি তাহার নিজের দেহ মনকে যেন দগ্ধ করিতে লাগিল। মানুষ যখন এত শীঘ্র জগতের সহিত তাহার সমস্ত সম্পর্ক চুকাইয়া দিয়া মরিয়া যাইতে পারে, তখন দুদিনের জন্য তাহার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করা তো মানুষের ভাল নয়!...আসমানের যত কিছু অন্যায়, অত্যাচার, উৎপীড়ন, অহঙ্কার,—তাহার যাহা কিছু মন্দ, মতিলাল যেন নিমেষেই ভুলিয়া গেল। তাহার শুধুই মনে হইতে লাগিল, সেও তো আসমানকে ছাড়িয়া কথা কয় নাই! তাহার নিজের কথার মধ্যে এমন কি একটা কথাও ছিল না, যাহা আস-মানকে কোনদিন অজানিতেও আঘাত করিয়াছে!... নিশ্চয়ই ছিল। আজ যদি সে-পথ থাকিত, তাহা হইলে মতিলাল তাহার পায়ে ধরিয়া সেজন্য ক্ষমা চাহিয়া লইতেও পশ্চাৎপদ হইত না।...

পাঁচু তাড়াতাড়ি আসিয়া তাহাকে সংবাদ দিল, বাবু না কি উপরের বারান্দায় বেহুঁস্ হইয়া পড়িয়া আছেন...কি জানি, বোধ করি মদ খাইয়া থাকিবেন।

মতিলালের সমস্ত চিন্তার পথ রুদ্ধ হইয়া গেল। দ্রুতপদে উপরে গিয়া দেখিল, বারান্দার উপর একটা ঘরের দরজার নিকট ইন্দ্রনাথ হাত-পা ছড়াইয়া অর্দ্ধশায়িত ভাবে বসিয়া বসিয়া যাহা মুখে আসিতেছে, পাগলের মত তাহাই বলিতেছেন। ঘরের ভিতর মদের একটা খালি বোতল এবং একটা গ্লাস ভাঙিয়া গড়াগড়ি দিতেছে দেখিয়া মতিলালের বুঝিতে আর কিছু বাকী রহিল না। তাড়াতাড়ি তাঁহার একটা হাত ধরিয়া তুলিয়া ধীরে-ধীরে ঘরের ভিতর শোয়াইয়া দিল। খানিকটা জল আনিয়া তাঁহার মাথা মুখ বেশ ভাল করিয়া ধুইয়া মুছাইয়া বলিল, চলুন, এবার বিছানায় শোবেন চলুন।

ইন্দ্রনাথ বলিলেন, না, বেশ আছি।

মতিলাল সে কথা শুনিল না। পাশের ঘরে তাঁহাকে বিছানার উপর বসাইয়া দিয়া মাথার উপর পাখাটা খুলিয়া দিল। ইন্দ্রনাথ একটু-খানি সুস্থ হইলে মতিলাল বলিল, একে আজ ক'দিন ধরে নাওয়া-খাওয়া নেই, শরীর গরম হয়ে আছে,—তার উপর বোধ করি জল-টল না দিয়েই ওটা খেয়ে ফেলেছেন?

ইন্দ্রনাথ কোন কথা না বলিয়া চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরে মতিলাল ধীরে-ধীরে জিজ্ঞাসা করিল এবার আপনার মেয়েদের এখানে নিয়ে এলেই হয়,—আপনার ভাইকে কাল খবর দেব?

ইন্দ্রনাথ ঘাড় নাড়িয়া নিষেধ করিলেন।

কোনরকমে সে রাত্রিটা কাটিয়া গেল।

পরদিন প্রাতে ইন্দ্রনাথ জোরে জোরে হাঁকিলেন, মতে! মতে!

ডাক শুনিয়া মতিলাল উপরে উঠিয়া আসিতেই, ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মার মত রক্তবর্ণ চক্ষু দুইটা যথাসম্ভব বিস্তৃত করিয়া তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, হারামজাদা, পাজি! তোকে রেখে' দেখ্‌ছি আমার দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষা হয়েছে···

কেন, কি হলো বাবু? দুধ-কলা আবার কবে দিলেন?

ইন্দ্রনাথ বলিলেন, আবার বলে, কি হলো?

তিন-তিনটে বড় হুইস্কির (whiskey) বোতল কাল ওঘরে রাখলুম,—কোথায় লুকিয়ে রেখেচিস্ বল্। ভুতো বল্‌ছে, তুই সরিয়েছিস্।

সরিয়েছি ছেড়ে' ভেঙে' ফেলে দিয়েছি। ওগুলো মিছে মিছি আর না খেলেই হয় বাবু!

ঈষৎ হাসিয়া ইন্দ্রনাথ বলিলেন, মতে গাঙ্গুলী এত সাধু হলো কবে থেকে?

হাস্‌ঠি-ঠাট্টা নয় বাবু, সত্যি বলছি, আমি ছেড়ে দিলুম। এই রাম, দুই, তিন, আর যদি কখনও খাই। বলিয়া মতিলাল তাহার দুই কর্ণে হস্তস্পর্শ করিয়া শপথ করিল।

ইন্দ্রনাথ বলিলেন, মাতালের দিব্যি আমি বিশ্বাস করি না। তুই যদি ছাড়্তে পারিস তাহ'লে তোকে আমি—

বাধা দিয়া মতিলাল বলিয়া উঠিল, না বাবু, আমায় কিচ্ছু দিতে হবে না। তার চেয়ে আপনি বলুন যে, আমি না খেলে আপনিও খাবেন না?—দেখুন বাবু, আমার ছেলেবেলাকার অভ্যেস্, আমি ছাড়তে পারছি আর আপনি পারেন না?

আচ্ছা বেশ, তবে সেই কথাই থাকলো।—কিন্তু বোতল তিনটে আছে ত? তার দাম অনেক।

আবার সে খবরে আপনার দরকার কি বাবু,—আপনি চুপ করুন না!...

২

ইন্দ্রনাথ ও চন্দ্রনাথ দুই সহোদর। কলিকাতার ইটালি অঞ্চলে একটা ছোট গলির ভিতর একটি ছোট দোতলা বাড়ীতে তাঁহারা পুরুষানুক্রমে বাস করিতেছেন। দুইজনেই বিপত্নীক; ইন্দ্রনাথের স্ত্রী দুইটি কন্যা রাখিয়া মারা গেছেন, কিন্তু চন্দ্রনাথের স্ত্রী কোন স্মৃতিচিহ্নই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। ইন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুচিত্রা, বিবাহের বৎসরখানেক পরেই বিধবা হইয়া পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে, ছোট কন্যা অসিতা এখনও অবিবাহিতা।

ইন্দ্রনাথ লোকটি গম্ভীর প্রকৃতির এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের মধ্যে আদি এবং অন্তের দুইটি বর্গ বাদ দিয়া অর্থ ও কামের দিকেই ঝোঁক্ তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। অর্থও তিনি জীবনে যথেষ্ট রোজগার করিয়াছেন, এমন্ কি এখনও পর্য্যন্ত এই অর্থের জন্য দুনিয়ার যত-কিছু খারাপ কাজ সমস্তই করিতে তিনি প্রস্তুত। তাঁহার মদ্যপান এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য কুকর্ম্মের নিমিত্ত তাঁহার স্ত্রীর সহিত প্রায় প্রত্যহই ঝগড়া-ঝাঁটি চলিত,—উভয়ের মধ্যে বনি-বনাও কোন-দিনই ছিল না। স্ত্রী কাঁদিয়া কাটিয়া দুঃখ করিয়া হাতে-পায়ে ধরিয়া অনুনয়-বিনয় করিতেন, ইন্দ্রনাথ সে-সব গ্রাহ্য না করিয়া আপ্-খুশী-মাফিক্ কাজ করিয়া যাইতেন। স্ত্রী বলিতেন, আমি মরে' গেলে

১৬

প্রতিবেশিনী ভুলির-মা অরুণদের বাড়ী বেড়াইতে আসিয়াছিল। প্রথমেই সে রান্নাঘরের দরজায় উঁকি মারিয়া বলিল, কই গো বৌমা, তোমার শ্বাশুড়ী কোথায় ?

অসিতা উনান হইতে অতি কষ্টে ভাতের হাঁড়িটা নামাইয়া ফেন গালিতে যাইবে, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে ভুলির-মা'র কণ্ঠস্বরে চমকিয়া উঠিতেই হাঁড়ি হইতে খানিকটা গরম ফেন তাহার হাতের উপর পড়িয়া গেল ; কিন্তু যন্ত্রণা হইলেও সেদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া বলিল, মা বোধ করি ও-ঘরে আছেন, দেখুন।

গরম ফেনটা যে অসিতার হাতে পড়িল, সে তাহা গোপন করিলেও ভুলির মা লক্ষ্য করিয়াছিল ; বলিল, আহা বাছা, হাতে কি তোমার ফেন পড়ে' গেল বৌ ?

না, ও কিচ্ছু হবে না। বলিয়া অসিতা আপন মনে কাজ করিতে লাগিল।

ভুলির-মা একবার চারিদিকে চাহিয়া কেহ আসিতেছে কি না দেখিয়া লইল, পরে গলাটা একটুখানি খাটো করিয়া বলিল, আমরাও তাই বলাবলি করছিলুম বৌ-মা। বলি, প্রথম শ্বশুর ঘর এলে' বৌকে আর কেউ হাঁড়ি ধরায় না। তা তোমার শ্বাশুড়ীর এম্‌নি আক্কেল

মা, বাসনমাজা থেকে সব কাজই তোমায় দিয়ে করাচ্ছে। বড় কষ্ট হয়,—নয় বাছা?

অসিতার বাঁ হাতটা জ্বালা করিতেছিল। সে মুখে কিছু না বলিয়া ঈষৎ হাসিল।

তা আমরা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে হলেও বুঝ্‌তে পারি। কিন্তু কে যাবে মা তোমার ও রণচণ্ডী শাশুড়ীর মুখে হাত দিতে? ঝাঁটার চোটে তার বিষ নামিয়ে দেবে!—তুমি একটু সোমত্ত মেয়ে বলেই পার, নইলে বাপ্‌ বাপ্‌ করে এতদিন পালিয়ে যেতে হতো।

কে গো, ভুলির-মা না কি?

উভয়েই সচকিতে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল, ক্ষীরোদাসুন্দরী বড় ঘর হইতে বাহির হইয়া রান্নাঘরের দিকেই আসিতেছেন।

ভুলির মা বলিল, হ্যাঁ মা। বলি, তোমার বৌ না কি বেশ রাঁধতে পারে? বেড়াতে আসছিলুম, তাই বলি বাটিটাও হাতে করে নিয়ে যাই,—দেখি, কলকাতার রান্নাই বা কেমন। বলিয়া সে তাহার অঞ্চলের অভ্যন্তর হইতে একটা কাঁসার বড় বাটি মেঝের উপর নামাইয়া রাখিল।

ক্ষীরেদাসুন্দরী বলিলেন, পিণ্ডি রাঁধে মা! ছাই-ভস্ম কি যে খাওয়ায় তার ঠিক নেই। এত বড় ধিঙ্গি মেয়ে, এত দিন বিয়ে হলে দশটা ছেলের মা হতো, বলি, হ্যাঁগা, আমরাও তো এককালে বৌ ছিলুম! বাপের ঘরে কি রান্নাটাও শিখে আস্‌তে হয় না?

ভুলির মা বলিল, তা আবার হয় না ক্ষীরু ?

না মা, কোন কাজের নয়। ওই দ্যাখ না ভুলির মা, ভাত রাঁধতে বসেছে, এদিকে কাপড়ের আঁচল ঠেকছে হাঁড়িতে,—আবার জামাটা চব্বিশঘণ্টা না পরে' থাকলে ওর ভাগবত অশুদ্ধ হয়ে যায়। এঁটো-মেটো কিছু বিচার নেই মা, জাত-জন্ম সব গেল—সব গেল।

অসিতা তাহার কাপড়ের আঁচলটা সরাইয়া লইল।

ক্ষীরোদাসুন্দরী বলিয়া উঠিলেন, দ্যাখ গো দ্যাখ, নিজের চোখেই দেখে যাও ভুলির-মা, সগ্‌ড়ি হাতেই কাপড়টা তুলে' নিলে। বলি, ও ডোম চণ্ডালের মেয়ে, হাতটা কি তোমার সগ্‌ড়ি নয় !

অসিতা বলিল, এ কাপড় নিয়ে তো আমি আপনার ঘরে যাচ্ছি না !—রান্নাঘরের সবই তো সগ্‌ড়ি।

ক্ষীরোদাসুন্দরী ভুলির-মার মুখের পানে তাকাইয়া কহিলেন, দেখ্‌লে ? শুন্‌লে মেয়ের স্পষ্ট জবাব ? একে নিয়ে আমি কি করি বল ত ?

কি আর কোরবে ক্ষীরোদা, দেখিয়ে-শুনিয়ে নিও।

দেখিয়ে শুনিয়ে নেবার মেয়েটি বেশ। এ তো কিছুই নয় ভুলির-মা, দু' একদিন এমন কথা বলে, যা শুন্‌লে মনে হয় বাড়ী থেকে দূর করে দি,—ছেলের আবার বিয়ে দিয়ে ঘরে বৌ আনি।

না মা, বিয়ে দিতে হবে কেন ? এই বৌ-ই তোমার ঘরের

লক্ষ্মী হবে দেখে' নিও। বড়লোকের মেয়ে কি না, তাই কাজ-কৰ্ম্ম তেমন শেখেনি হয়ত'।

ক্ষীরোদাসুন্দরী বলিলেন, বড়লোকের আর সীমা নেই! সে কথা আর বলো না ভুলির মা! এই যে ছ' সাত মাস এসেছে, তা কাকের মুখেও একটা তত্ত্ব তল্লাস নেই।

এমন সময় রাণী ছুটিয়া আসিয়া বলিল, বৌ, ভাত দাও।

শ্বাশুড়ী শুনিতে না পান এই ভাবে অসিতা চুপি চুপি কহিল, তোমার কি কোথাও কোন কাজ আছে ঠাকুরঝি, এত তাড়াতাড়ি কিসের?

তোমার অত সব জমা খরচে কাজ কি বৌ, তুমি দাও না!

বাবা এখনও খান্‌নি, আর আমার রান্নাও এখনও শেষ হয়নি, একটু বসো না ভাই!

রাণী বলিল,—না বস্‌ব না, যা হয়েছে তাই দাও। দুগ্‌গাদের বাড়ী দশ-পঁচিশ খেলছিলুম, হেরে' গেলুম—আবার যেতে হবে। দাও না! কি কোরছ বসে' বসে'?

ভুলির মা বলিল, অম্‌নি আমারও বাটিতে এক হাত দিয়ে দিও বৌ, আমিও যাই।

অসিতা প্রথমে তাহাকেই বিদায় করিয়া রাণীকে ভাত দিতে বসিল। ক্ষীরোদাসুন্দরী ভিজে মাথাটা শুকাইবার জন্য উঠানে গিয়া বসিলেন।

দশ-পঁচিশ খেলায় হারিয়া গিয়া রাণীর মেজাজটা ভাল ছিল না; তাই খাইতে বসিয়া প্রথম হইতেই রান্নার বহুবিধ ত্রুটি সে আবিষ্কার করিতে লাগিল।

কি-একটা তরকারীতে নুন কিছু কম হইয়াছিল। রাণী সেটা মুখে দিয়াই থু, থু, করিয়া ফেলিয়া দিল। বলিল, মা গো মা, কি বিশ্রী রান্না! ছাই-পিণ্ডি কি যে খাব তার ঠিক নেই।

ক্ষীরোদাসুন্দরীর কাণে পৌঁছিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, কি হয়েছে কি রাণী?

রাণী বলিল, আজ আর কিছু মুখে দিতে পারবে না মা,—যা রান্না করেছে তোমার বৌ! একবার খেয়ে দেখো।

ক্ষীরোদাসুন্দরী জোরে-জোরে কহিলেন, হতভাগী, ছোটলোকের মেয়ে, ইচ্ছে করে' খারাপ রাঁধে তা কি আমরা বুঝ্‌তে পারি না! তুমি যাও পাতায় পাতায় তো আমি যাই শিরায় শিরায়! বলি, আজও কি উপোস দিতে হবে না কি গা? বলিয়া তিনি রান্নাঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রাণী তখন ভাতের থালাটা শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ক্ষীরোদা বলিলেন, উঠ্‌লি কেন মা, বোস্‌। দুধ দিয়ে চারটি ভাত দি, খেয়ে নে। জানি ও-আবাগী অম্‌নি রাঁধ্‌বে।—যাও মা যাও, তুমি ওঠ এখান থেকে। বলিয়া অসিতার বাঁ হাতটা ধরিয়া তাহাকে টানিয়া-হিঁচ্‌ড়াইয়া রান্নাঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন।

হাতের যে-স্থানটা পুড়িয়া গিয়া ফোস্কা উঠিয়াছিল, ঠিক্ সেই জায়গার উপরেই ক্ষীরোদার হাতের চাপ পড়িয়া ফোস্কাটা গলিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণায় অসিতা অস্থির হইয়া পড়িল। ডান্ হাত দিয়া তাহার বেদনার্ত্ত হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া অসিতা তাহার উপর কয়েকবার ফুঁ দিতেই রাণী বলিয়া উঠিল, মা তো তোমায় মারে নি বৌ, হাত দিয়ে একটু ছুঁয়েছে বই তো নয়? তার আবার কান্না কিসের গা?

অসিতার চোখে সত্য সত্যই জল আসিয়া পড়িয়াছিল। অতি সাবধানে আঁচলের খুঁটে তাহা মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, কাঁদব কেন ভাই, ফেন্ গড়াতে গিয়ে হাতটা পুড়ে' গেছে···

কই দেখি। বলিয়া রাণী দূর হইতে অসিতার হাতখানা দেখিয়া ক্ষীরোদাসুন্দরীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, দেখে যাও মা, ফেন্ গড়াতে গিয়ে তোমার বৌ কেমন হাত পুড়িয়েছে। এইবার ডাক্তার ডাক্‌তে হবে।

হ্যাঁ, তা আবার হবে না! বলিতে বলিতে ক্ষীরোদা একথালা ভাত এবং খানিকটা দুধ আনিয়া রাণীর সম্মুখে ধরিয়া দিয়া কহিলেন, সব মিছে কথা মা, ও ডাকাত মেয়ের কাণ্ডকারখানা কি আমার জান্‌তে বাকী আছে? কাল থেকে রাঁধতে হবে না মনে করে' এই কাণ্ডটি করা হলো।

অসিতার বেদনার্ত্ত মুখের পানে একবার ক্রূর কটাক্ষ হানিয়া তিনি

আবার বলিতে লাগিলেন, সাধ করে' যে-মেয়ে গরম ফেন্ হাতে ঢাল্‌তে পারে, তার অসাধ্যি কাজ নেই মা! আবার ভয় হয়, বিষ-টিষ খেয়ে কোন্ দিন আমাদের ঘর-গুষ্টিকে না বাঁধিয়ে দেয়!

এই সব কথার উত্তরে কোন-কিছু বলিতে না পারিয়া অসিতা মনে-মনেই পুড়িয়া মরিতেছিল। এইবার ধীরে-ধীরে বলিল, নিজের গায়ে কি কেউ কখনো...

কথাটা তাহাকে শেষ করিতে না দিয়া ক্ষীরোদা তাহার মুখের হাত নাড়িয়া বলিলেন, পারে গো পারে। আর কেউ না পারুক্, তোমার মতন দস্যি মেয়েতে পারে। আমরা মা কচি-খুকি নই, ছেলে-পুলে নিয়ে ত্রিশটি বছর ঘর-সংসার করছি,—লোকের ভাব-গতিক দেখেই মনের কথাটা টের পাই।

অসিতা বলিল, কি টের পেলেন? আমি কি করেছি মা?

ক্ষীরোদাসুন্দরী মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিলেন, আর তো কিছু জান না,—এই ঢং ঢাংটুকুই শিখেছ! এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি রান্না-ঘরের শিকল টানিয়া দিতে গেলেন, পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, বেশী চেঁচিয়ো না বল্‌ছি,—আজ থেকে' আমার সঙ্গে কথা কয়ো না বৌমা! তোমার যা খুসী তাই কর,—কাল থেকে আমিই তোমাকে রেঁধে রেঁধে খাওয়াব, তুমি পায়ের উপর পা দিয়ে বসে' বসে' খেয়ো।

রেঁধে খাওয়াতে কেন হবে মা? আমার তো বাপের বাড়ী আছে, ভাল না লাগে, সেইখানেই পাঠিয়ে দিলে হয়!

মুখে এক প্রকার অদ্ভুত শব্দ করিয়া ক্ষীরোদা বলিলেন, আ, বাপের বাড়ীর ত সীমে নেই! তাও যদি তত্ত্ব তল্লাস করতো। তাহলে তুমি হাতে মাথা কাটতে মা, শ্বাশুড়ী শ্বশুরকে নাথি মারতে! অরুণের কথা শুনে' ত' আমি লজ্জায় মরে গেলুম। বাপ এক বেউশ্যে নিয়ে সরে' পড়েছে,—মা ত নেই,—একটা বিধবা দিদি আছে, তাও আবার অরুণের মুখে শুনলুম, সে নাকি ফিরে ফিরতি আর একটা বিয়ে করবার চেষ্টায় আছে।—ছি-ছি ছি-ছি ছি-ছি! খিরিস্তানের ঘরের মেয়ে, আমারও পোড়া কপাল—

এমন সময় তাহার চীৎকারে উমেশবাবু ছুটিয়া আসিয়া কহিলেন, কি হলো কি গা? এ হারামজাদীর বেটি বৌকে এনে যে আমার সব গেল!

উমেশবাবুকে দেখিয়াই ক্ষীরোদাসুন্দরী কাঁদিয়া দিলেন। চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন, এখনই হয়েছে কি, দাঁড়াও! বৌ তোমার ভিটেয় মুরগী চরাবে তবে ছাড়বে। কোথাকার এক ডোম্ চণ্ডালের মেয়েকে ধরে' এনে আমার হাড় সুদ্ধ জ্বলিয়ে দিলে। মা গো মা! বুড়ো হাবড়া হয়েছ বলে' কি চোখের মাথাও খেয়েছ গা? এটাকে ঘরে আনতে তোমার ঘেন্নাও হলো না?

উমেশবাবু বলিলেন, আ হা হা হা, আমি কি সে কথা আগে টের পেলুম ছাই, তাহ'লে কোন্ শালা ও বেজাতের মেয়েকে ঘরে' আনতো! তার জন্যে তোমার কান্না কিসের? ও আপদ আমি বিদেয়

করছি তবে ছাড়ছি, রসো। বলিয়া তিনি রাগে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

ক্ষীরোদাসুন্দরীর চোখের জল এইবার একটু বেশী করিয়া গড়াইয়া পড়িল। বলিলেন, কাঁদছি কি আর সাধে? শ্বাশুড়ীকে না কাঁদিয়ে ও আবাগী কোন দিন জলগ্রহণ করে দেখেছ?

উমেশবাবু রান্নাঘরের খুঁটিতে বার দুই তিন হাতটা চাপড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন, তবে এই শুনে' রাখ রাণীরমা, এই আসছে ফাল্গুন মাসের শেষ নাগাদ আমার অরুণের যদি ফের না বিয়ে দিতে পারি ত' আমাকে তুমি যা-খুসী তাই বলে ডেকো,—আমাকে তুমি···এই, এই, দিব্যি করে বল্‌ছি, আমি তাহ'লে বামুন থেকে খারিজ্!...

এইবার পরম পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন শেষ করিয়া রাণী এতক্ষণে অসিতার কাছে দাঁড়াইয়া পিতামাতার পরম প্রীতিকর এই আলোচনাটা বেশ মনোযোগ সহকারে শুনিতেছিল। উমেশবাবুর বক্তৃতা শেষ হইবা-মাত্র অসিতার মুখের নিকট সে তাহার এঁটো হাতখানা নাড়িয়া দিয়া বলিল, কেমন হয়েছে? বড় আস্পর্দ্ধা তোমার? বলিয়াই সে আঁচাইবার জন্য ছুটিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

উমেশবাবুর প্রতিজ্ঞাটা আরও বেশী দৃঢ় করিয়া লইবার জন্য ক্ষীরোদাসুন্দরী তাঁহার কথাগুলা অগ্রাহ্য করিয়া বলিলেন, মুখের কথায় আমি বিশ্বাস করি না। তোমার কথায় কুকুরে ইত্যাদি ইত্যাদি

তোমার যা-খুশী করো, চোখের সুমুখে এসব আর দেখা যায় না। ইন্দ্রনাথ তাহাতে সায় দিয়া বলিতেন, তুমি আজই মর। দুর্নীতি-পরায়ণ স্বামীর এই অধঃপতন দেখিয়া তাঁহার সত্যসত্যই এক এক দিন আত্মহত্যা করিয়া মরিতে সাধ হইত, কিন্তু মেয়ে দুইটার মুখ চাহিয়া মরিতেও পারিতেন না। সুচিত্রা ও অমিতার পরিণাম চিন্তা করিয়া তিনি যখন কাঁদিতে বসিতেন, ইন্দ্রনাথ তখন মদ খাইয়া হো হো করিয়া হাসিতেন। কিন্তু তাঁহারই সহোদর চন্দ্রনাথ ছিল মাটির মানুষ। অল্প বয়সে যখন তাহার স্ত্রী-বিয়োগ হইল, তখন সে সবেমাত্র বি-এ পাশ করিয়া বাড়ীতে বসিয়া আছে। ইন্দ্রনাথের স্ত্রী তাহাকে পুনরায় বিবাহ করিয়া সংসার পাতাইবার জন্য অনুরোধ করিলে, সে তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া বলিত, বিয়ে আমি আর কোর্‌ব না বৌ'ঠান্, আপনি আমায় আর অনুরোধ কোরবেন না। সুচিত্রা, অমিতার বিয়ে-থা দেই, তারা সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর কন্না করুক্—ব্যাস্, আর কি চাই! সুচিত্রার বিবাহ তিনি দিলেন বটে, কিন্তু বৌ-ঠাকুরাণী তাহাদের সুখের ঘর-কন্না আর স্বচক্ষে দেখিতে পাইলেন না, বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতেই পরপারের ডাকে তিনিও চলিয়া গেলেন, সুচিত্রাও স্বামী হারাইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। চন্দ্রনাথের বুকে এ আঘাত বড় নিষ্করুণ ভাবেই আসিয়া বাজিল, নিজের হাতে মানুষ-করা এই বিধবা অভাগীকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া ছেলেমানুষের মত কাঁদিয়া আকুল হইল।

পারবে ! এবার কিন্তু এমন কুটুম করা চাই, যেন তত্ত্বের হাঁড়িতে ঘর বোঝাই হয়ে ওঠে। লোকে যেন বলে যে, হ্যাঁ বাপু, এলে বিয়ে পাশ করা ছেলের বিয়ে একটা হলো বটে !...

অসিতা তখনও পর্য্যন্ত এক ফোঁটা জলগ্রহণ করে নাই। সে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। ধীরে ধীরে সেইখানেই দেওয়াল ধরিয়া সে বসিয়া পড়িল।......

১৭

মাঘ মাসের মাঝামাঝি।

পল্লীগ্রামে শীতের প্রকোপ বেশ প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছে। প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে অসিতাকে শয্যাত্যাগ করিতে হইত;—আজিও করিল। পরণের কাপড়খানা খালি গায়ে বেশ করিয়া জড়াইয়া লইল; কিন্তু সে দুরন্ত শীতের শিহরণ কোন প্রকারেই থামিতেছিল না। গায়ের গরম কাপড় কেহ কিনিয়া দেয় নাই,—পল্লীসভ্যতার খাতিরে গায়ে একখানা জামা পর্য্যন্ত দিবার উপায় নাই! দিলে হয়ত' একদিকে যেমন শীতের প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইবে,—কন্‌কনে' শীতল বায়ু তাহার মুক্ত-গাত্রে আর বিঁধিবে না, অন্যদিকে তেম্‌নি তার চেয়েও তীব্র শ্বাশুড়ী-ননদের কটু কথার ঝাঁঝ, দেহের সমস্ত আবরণ ভেদ করিয়া তীক্ষ্ণ-সূচের মত তার বুকের উপর ফুটিতে থাকিবে!...

তেমনি ভাবে কাঁপিতে কাঁপিতে অসিতা বাহির হইয়া গেল। রান্নাঘর হইতে গত রাত্রির এঁটো বাসনের বোঝাটা অতিকষ্টে ধীরে-ধীরে কাঁধে তুলিয়া লইয়া সে পুকুরের ঘাটে গিয়া সেগুলা মাজিতে বসিল। প্রথম প্রথম অনভ্যস্ত অসিতা এসব কাজ বেশ করিতে পারিত না, কিন্তু এখন সে সবই পারে। শীতকালের সকালে জল ও বালি দিয়া বাসন মাজিয়া তাহার হাতের পাৎলা চামড়া স্থানে-স্থানে কাটিয়া গেছে, সময়

সময় অতিরিক্ত যন্ত্রণাও হইতে থাকে, কিন্তু বাধ্য হইয়া সেই বেদনার্ত্ত হাত দুইটাকেই সংসারের দৈনন্দিন যাবতীয় কর্ম্মেই লিপ্ত রাখিতে হয়!...জামা গায়ে না দিয়া বাহির হইতে প্রথমে তাহার লজ্জা হইত; কিন্তু এখন তাহার লজ্জা-শরম কিছুই নাই! প্রথমে সে ময়লা এবং ছেঁড়া কাপড় পরিতে পারিত না, এখন শতচ্ছিন্ন মলিন বস্ত্র পরিধান করিতেও সে কোনপ্রকার দ্বিধাসঙ্কোচ বোধ করে না! যে রূপ এবং সৌন্দর্য্য লইয়া অসিতা প্রথম স্বামিগৃহে আসিয়াছিল, এখন সেগুলি যেন একটি একটি করিয়া তাহার সর্ব্ব দেহ হইতে খসিয়া পড়িয়াছে! অস্থি এবং চর্ম্মের উপর তাহার গত গরিমার যেটুকু চিহ্ন এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া সহজে তাহাকে কাহারও চিনিবার উপায় নাই! শীতের এ শীর্ণা তটিনীর কূলে ভাদ্রের সে ভরা-নদীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না!......

শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে অসিতা একখানি ধরিয়া বাসন মাজিতেছিল আর ভাবিতেছিল, এই ত' নারীর জীবন, এই ত' তাহার ভবিষ্যৎ! সহরে বসিয়া পল্লীবালা এবং পল্লীবধুর কত সুখ-সৌভাগ্যের কাহিনী, কত সৌন্দর্য্যের কথা সে ছাপার অক্ষরে কেতাবে পড়িয়াছিল,—কে জানিত যে সে অর্ব্বাচীন কেতাবওয়ালারা এত মিথ্যা বলে! আর বাংলার যে-সব পর-নির্ভর তরুণ ভালবাসিবার এবং ঘর বাঁধিবার বড়াই করে,—তাহারাই বা কেমন!

অসিতার মনে হইতে লাগিল, যৌবনের সমস্ত তৃষ্ণা লইয়াই তো

সে জাগিয়া উঠিয়াছিল, সে তো একেবারে নীরেট বর্ণজ্ঞানহীন নিরক্ষর ছিল না, যৎসামান্য হইলেও রূপও তো তাহার কিছু ছিল, তবে কেন সে এই শাহারা মরুপ্রান্তে শুকাইয়া মরিল? কাহার অভিশাপে তাহার এই বাসন্তী মঞ্জরী মুকুলেই ঝরিয়া পড়িল? সে তো তাহার জীবন দিয়া, প্রেম দিয়া, অনেক কিছু করিতে পারিত,—স্বামী, সন্তান, গৃহ, এবং সমাজের অনেক কল্যাণ তাহার হাতের মধ্যে ছিল, অনেকের অনেক সুখ সৌভাগ্যের ভাণ্ডার তাহারই অন্তরতলে এখনও হয়ত লুকানো রহিয়াছে,—কিন্তু আজ তাহার সমস্ত সঞ্চয় ব্যর্থ হইয়া গেছে বলিয়াই পরের জন্য সঞ্চিত সুখ-সৌভাগ্য আজ তাহার নিজেরই দুঃখ-দুর্ভাগ্যের মূর্ত্তিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে,—আজ সে নিঃস্ব ভিখারিণী হইয়াছে বলিয়াই একটা পথের কুকুরও তাহাকে লাথি মারিয়া যাইতে কুণ্ঠিত হয় না!···বোধ করি এই দাসী-বাঁদির কাজেই তাহার নারী-জীবনের সমস্ত উৎকর্ষ সাধিত হইয়া গেল! তা-ই যদি হয়, নারীর যদি ইহার বেশী কিছু আশা করিবার না থাকে, যদি তাহারই অনুকরণে সকলেরই ললাটলিপি লিখিত হইয়াছে, যদি অসামঞ্জস্যের ক্ষতিপূরণ করিতে এবং গরমিল মিলানোর অঙ্ক কষিতেই নারীর সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য নিয়োজিত হয়,—তাহা হইলে এ ব্যর্থ বিবাহিত জীবনে কিসের প্রয়োজন?

আজ কোথায় তাহার দিদি? যাহাকে ছাড়িয়া সে একদণ্ড থাকিতে পারিত না, আজ কত দিন তাহাকে দেখে নাই! আর কি কোন দিন দেখিতে পাইবে! তাহাকে সে আগে চিঠি লিখিত, কিন্তু

গত দুইমাস কাল শাশুড়ীর নিষেধ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া সে চিঠি লিখিতে পারে নাই, অধিকন্তু যতগুলি চিঠি তাহার দিদির নিকট হইতে আসিয়াছে, একটি-একটি করিয়া তাহার সমস্তগুলিই নিজে পড়িয়া ক্ষীরোদাসুন্দরী তাহার চোখের সুমুখে ছিড়িয়া ফেলিয়াছেন।

এতদিন চিঠি না পাইয়া তাহারা কি ভাবিতেছে কে জানে! তাহার দিদি যদি সংবাদ আনিবার জন্য নিখিলদাকে পাঠায়!·· যদি কাকাবাবু নিজে আসেন!···অসিতা একবার তাহার পরিধেয় মলিন বস্ত্রখানার দিকে তাকাইল। সে কি এমনি ভাবে এমনি হীন বেশে তাহাদের সম্মুখে বাহির হইতে পারিবে! এমনি জামা গায়ে না দিয়া··· এমনি ময়লা কাপড়ে···আর এই এত ছেঁড়া!·· কখনই না। এইবার অসিতার লজ্জা হইল। এইবার সে যেন নিমেষেই বুঝিতে পারিল, সে কি ছিল, আর কি হইয়াছে! অসিতার ইচ্ছা করিতেছিল, সে বিদ্রোহ করে, কিন্তু হাসি পায়; পরাধীন দাসের যাহারা দাসী, তাহাদের আবার বিদ্রোহ!

অসিতার বাসন মাজা শেষ হইলে সে ঘরে আসিল। রান্নাঘরটা পরিষ্কার করিয়া নিজে কয়লা ভাঙ্গিয়া উনান ধরাইল। এইবার শাশুড়ী-শ্বশুর, এমন কি রাণীর বিছানাটা পর্য্যন্ত তুলিয়া দিতে হইবে—এত প্রত্যূষে তাহারা শয্যাত্যাগ করিল কি না কে জানে! অসিতা ঘরের দরজার নিকট আসিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল, রাণী গায়ে গরম কাপড় জড়াইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। অসিতা জিজ্ঞাসা করিল, মা উঠেছেন?

আমি জানি না। কেন, চোখের মাথা তো খাওনি?

উমেশবাবু প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া পাশের ঘরে বসিয়া তামাক টানিতেছিলেন। তিনি আফিংখোর মানুষ, কাজেকাজেই এমনি সময় তাঁহার একটুখানি চা না হইলে চলে না। অসিতার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া তিনি হাঁকিলেন, চা হলো? কতক্ষণ বসে' থাকবো?

অসিতা তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে ফিরিয়া গেল। উনানটা তখনও ধরে নাই,—তাই একটা পাখা লইয়া বাতাস করিতে আরম্ভ করিল। কয়লার ধোঁয়ায় চারিদিক অন্ধকার হইয়া গেল,—তাহার চোখ দিয়া দর্ দর্ করিয়া জল গড়াইতে লাগিল, দম বন্ধ হইয়া আসিতেছিল, মারাত্মক স্থান হইতে তাহার চলিয়া যাইবার উপায় নাই! প্রাণপণে বাতাস করিতে করিতে প্রায় দশ-পনর মিনিট পরে উনানটা ধরিয়া উঠিল।

চায়ের জল চড়াইয়া দিয়া, অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম আনিবার জন্য অসিতা বড়ঘরের দিকে যাইতেছিল,—কয়লার ধোঁয়ায় তাহার চোখদুটা একেবারে অন্ধের মত হইয়া গিয়াছিল। এমন ভাবে চোখ দিয়া জল ঝরিতেছিল যে অসিতা তাহার সম্মুখে কিছুই দেখিতে পাইতেছিল না। উঠান পার হইয়া ঘরে ঢুকিতে যাইবে, এমন সময় হঠাৎ সে ধাক্কা খাইয়া বাঁধানো রকের উপর পড়িয়া গেল। পার্শ্বের দেওয়ালের গায়ে মাথাটা তাহার এত জোরে লাগিল যে, যন্ত্রণায় অধীর হইয়া কিয়ৎক্ষণ সে ভূমিশয্যা হইতে উঠিতে পারিল না। শুধু মাথার যন্ত্রণা হইলেও বা রক্ষা

ছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীরোদাসুন্দরী তাহার বুকের উপর সজোরে এক লাথি মারিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, আমার সঙ্গে শত্রুতা! ভেবেছিলেন, আমায় ফেলে দেবেন কিন্তু পড়লেন নিজেই! শয়তানী! বাঁদী! আমায় ধাক্কা আর দিবি কখনও? বলিয়া তাহার পৃষ্ঠের উপর আর এক লাথি বসাইয়া দিলেন।

ব্যাপার এমন বিশেষ কিছুই নয়। ক্ষীরোদাসুন্দরীর অভ্যাস,—তিনি শয্যাত্যাগ করিবার পর, একরকম চোখ বুজিয়াই মুখ-হাত ধুইবার জন্য খিড়্‌কির ঘাটে চলিয়া যান। চোখ বুজিয়া যাইবার কারণ এই যে, চোখে জল না লইয়া বাসিমুখে তিনি কাহারও মুখ দেখিতে চান না। না জানি, কাহার খারাপ মুখ দেখিয়া দিনের যাত্রা আরম্ভ করিলে হয়ত' সমস্তটা দিন তাঁহার মনে শান্তি থাকিবে না,—প্রত্যেকটি কাজেই হয়ত' অমঙ্গল ঘটিবে!...আজও সেইরূপ চোখ বুজিয়াই চলিতেছিলেন, অপর দিক হইতে অসিতাও আসিতেছিল; হঠাৎ এই অপ্রীতিকর সংঘর্ষে তিনি সুনিশ্চিত ভাবেই ধারণা করিয়া লইলেন যে, অসিতা বোধ করি ইচ্ছা করিয়াই তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিবার জন্যই এই কাণ্ডটি করিয়াছে।

ক্ষীরোদাসুন্দরী এই বলিয়া গর্জ্জিতে লাগিলেন যে, পারত পক্ষে সকালে উঠিয়া তিনি যাহার অলক্ষণে থথানা দেখিতে চান না, আজ তাহারই মুখ দেখিতে হইল,—হয়ত' আজ পেটে অন্ন জুটিবে না,—হয়ত' আজ ঝগড়া খিটিমিটি সমস্ত দিন চলিবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ক্ষীরোদাসুন্দরী অবজ্ঞাভরে মুখখানা ফিরাইয়া লইলেন, কোন কথা বলিলেন না।

অসিতা হঠাৎ সেইখানে বসিয়া পড়িয়া তাঁহার পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, আমার যদি কোন অপরাধ হয়ে থাকে মা, ক্ষমা করুন।

ওমা! এ আবার কি করে গা। যা, যা! দুর হ এখান থেকে। বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

অসিতার ব্যথিত ম্লান চক্ষু দুইটি অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে আর একবার তাহার ব্যগ্র ব্যাকুল হস্ত দুইটি প্রসারিত করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছিল, ক্ষীরোদাসুন্দরী তাহাকে এক ঝাঁকানি দিয়া সবেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

দরজার চৌকাঠ ধরিয়া অসিতা নিজেকে সামলাইয়া লইল, যেটুকু অশ্রু তাহার চোখ দিয়া বাহির হইয়াছিল, তাহাও শুকাইয়া গেল। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা, প্রকাশের অসহ্য বেদনায় তাহার অন্তরতলে গুমরিয়া মরিতে লাগিল।

অসিতা ধীরে ধীরে রান্নাঘরে আসিয়া চুপ করিয়া বসিল। শ্বাশুড়ী না খাইলে সেই বা খাইবে কেমন করিয়া!...

এমন সময় দরজা হইতে পিয়ন ডাকিল, চিঠি! চিঠি!

চিঠি! আশা ও আনন্দে অসিতা সচকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এই সময় বাড়ীতে কেহ নাই,—রাণী বাহির হইয়া গেছে, শ্বাশুড়ীও

চলিয়া গেলেন, শ্বশুর হয়ত চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া দাবা খেলিতেছেন,—কাহার চিঠি, কোন্ দূরের খবর সে আনিয়াছে, দেখিতেই বা দোষ কি ! অসিতা এত বেশী অধৈর্য্য এবং অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল যে, বধূ হইয়াও সে পিয়নের হাত হইতে চিঠি লইবার জন্য অগ্রসর হইতে কুণ্ঠিত হইল না।

একখানা খাম ও একখানা পোষ্টকার্ড দরজায় ফেলিয়া দিয়া পিয়ন চলিয়া গিয়াছিল। অসিতা আগ্রহাতিশয্যে চিঠি দুইখানা তুলিয়া লইয়া তাহার পরিচিত হস্তাক্ষর দেখিয়াই বুঝিল, খামখানা তাহার দিদি তাহাকেই লিখিয়াছে—আর কার্ডখানা তাহার শ্বশুরকে।

দ্রুতপদে চিঠি দুইখানা লইয়া অসিতা রান্নাঘরের শিকল খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল এবং খামের চিঠিখানি না খুলিয়াই তাহার উপরে কয়েকবার চুম্বন করিল। পোষ্টকার্ডখানা আগে পড়িয়া লইবে ভাবিয়া অসিতা জানালার কাছে দাঁড়াইয়া আগে সেইখানাই পড়িয়া ফেলিল। কাকাবাবু তাহার শ্বশুরকে জানাইয়াছেন যে, তাঁহার শরীর অসুস্থ এবং সেইজন্য যদি দয়া করিয়া একবার অসিতাকে এখানে পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়। ইত্যাদি।

সম্মুখে ছোট জানালাটার ফাঁক দিয়া ধূসর আকাশটা দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। অসিতা উদাস দৃষ্টিতে একবার সেই সুদূরের পানে তাকাইল। তাহার দিদি, কাকাবাবু আর নিখিলদাকে লইয়া কলিকাতার সেই গলির ভিতরে তাহার চিরপরিচিত একটি গৃহের ছবি

হঠাৎ তাহার চোখের সুমুখে অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল। সে গৃহ, সে সংসার, সেই কলিকাতা, সেই নিখিলদা, সেই কাকাবাবুর স্নেহ, সেই দিদির কোল, আজ যেন তাহার কাছে ওই আকাশের মতই সুদূর,—দুনিরীক্ষ্য! ..সেথানে বোধ করি আর সে কোন দিন পৌঁছিতে পারিবে না!...

অসিতা যে সঙ্গোপনে আজ তাহার নিজের চিঠিই চুরি করিয়া পড়িতে আসিয়াছে, সে কথা সে ভুলিয়া গেল। বিরহব্যথাতুরা দিদির দুটি সজল চক্ষু তাহার চোখের উপরে ভাসিয়া উঠিল,--অসিতা তাহার ব্যগ্র উন্মুখ দৃষ্টি যেন সে দিক হইতে ফিরাইতে পারিতেছিল না!... দিদিকে যে তাহার অনেক কিছু বলিবার আছে। এই ক'মাস ধরিয়া অনেক কথা,—অনেক ব্যথা যে সে তাহার জন্য সঞ্চয় করিয়াছে!... দিদি! দিদি! ভাই!

হঠাৎ চিলের মত ছোঁ মারিয়া কে যেন তাহার হাত হইতে চিঠি দুইখানা কাড়িয়া লইয়া অন্ধকার রান্নাঘরের মধ্যে হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। অসিতা মুখ ফিরাইয়া দেখিল, রাণী।

বলিল, দাও লক্ষ্মী বোন্‌টি আমার,—আমি যে এখনও পড়িনি ভাই?

রাণী বলিল, না পড়লে তো আমার কি? মা আসুক, মাকে দেব।

মিনতি-কাতর কণ্ঠে অসিতা আবার কহিল, দে ভাই, তোর হাতে ধরি, তোর পায়ে পড়চি, দে ভাই!

এ দিকে ঠিক এই সময়টায় কনিষ্ঠ ভ্রাতার উপর সমস্ত দায়িত্বের বোঝা চাপাইয়া ইন্দ্রনাথ ইহাদের সংস্রব হইতে একটুখানি দূরে সরিয়া গেলেন। যে দুষ্টচারিণীর মোহে ইন্দ্রনাথ এতদিন নিজ স্ত্রী, কন্যার স্নেহ-মমতায় ধরা না দিয়া পঙ্কিল আবিলতার মধ্যে ধীরে-ধীরে তলাইয়া যাইতেছিলেন, এইবার তাহাকে লইয়া তিনি প্রকাশ্যভাবে পার্ক ষ্ট্রীটে এক প্রকাণ্ড বাড়ী ভাড়া করিয়া সেইখানেই তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সদ্ব্যয় করিতে সুরু করিলেন। এবং সুচিত্রা ও অসিতাকে লইয়া চন্দ্রনাথ ইটালীর বাড়ীতেই বাস করিতে লাগিল। কোনরকমে কিছুদিন চলিবার পর, অর্থের অভাবে তাঁহাদের সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ করা যখন এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিল, তখন চন্দ্রনাথ এক দিন পার্ক ষ্ট্রীটের বাড়ীতে গিয়া বলিল, তুমি ত' চলে' এলে দাদা, কিন্তু আমাদের চলে কেমন করে?

ইন্দ্রনাথ তখন মদের নেশায় চুর হইয়া বসিয়া ছিলেন,—ভ্রাতাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়া কহিলেন, আমি কি জানি? ঘরে বসে থাক্‌বার জন্যে তো বি-এ পাশ করিস্ নি, চাক্‌রী ক'রে চালাগে যা। আমি যেমন করে' রোজগার করেছি, তুইও কোরতে পারিস্, কর্‌গে।

দাদার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিয়াছে ভাবিয়া চন্দ্রনাথ বিষণ্ণ মুখে সেখান হইতে ফিরিয়া আসিল, তাঁহার কথার কোন উত্তর দেওয়াও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করিল না। ভাবিল, চাক্‌রী করিয়াই সে সংসার চালাইবে, দাদার দ্বারস্থ আর কোনও দিন হইবে না।

এই বলিয়া সে তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছিল, রাণী ছুটিয়া উঠানে গিয়া দাঁড়াইল।

অসিতা রান্নাঘরের দরজা হইতে সকরুণ দৃষ্টিতে একবার তাহার পানে তাকাইয়া ডাকিল, রাণী!

বটে? রাণী বলে' ডাক্‌লে? তাহ'লে তো দেবই না।

না ভাই, ভুল হয়ে গেছে। ঠাকুরঝি বলেই ডাক্‌চি। এসো, লক্ষ্মীটি দাও।

দাঁড়াও না। পাগল হলে' না কি? দিচ্ছি, দিচ্ছি, দাঁড়াও। বলিয়া রাণী একবার চিঠি দুইখানা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া লইল।

হ্যাঁ, হয়েছে। এবার দাও লক্ষ্মী মাণিক আমার!

ক্ষেপ্‌চো কেন বৌ? টুনীদের বাড়ীতে মা খেতে বসেছে,—এলো বলে। একটু সবুর সইছে না? বলিয়া হাসিতে হাসিতে চিঠি দুইটা হাতে লইয়া রাণী বড় ঘরে প্রবেশ করিল।

অসিতা উদাস দৃষ্টিতে আর একবার আকাশের পানে তাকাইল; দেখিল, নীল আকাশের গায়ে ধূসর মেঘাস্তরণের নীচে কয়েকটা চিল ক্রমাগত ঘুরপাক খাইতেছে।...

১৮

অসিতার দিনের কাজ যখন আরম্ভ হইত, শেষরাত্রির অন্ধকার তখনও কাটিত না। ছুটি পাইত,—কোন দিন বা বিশ্রব্ধ পল্লী-রজনীর নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে,—কোনও দিন বা বিলম্ব আরও একটুখানি বেশী হইত। কিন্তু বাংলার মেয়েদের বোধ করি তাহাতেও বিশেষ-কিছু আসে-যায় না; তবে, অসিতার আজ যেন একটুখানি কষ্ট হইতেছিল। শ্বাশুড়ীর আহার হয় নাই বলিয়া একে ত' সে সমস্ত দিন উপবাস করিয়া আছে, তাহার উপর মনটাও তাহার আজ বেশ ভাল ছিল না। এক গ্লাস জল ব্যতীত সে আজ সারা দিনের মধ্যে কিছু মুখে দিতে পারে নাই। ক্ষুধা না থাকিলেও এখন ঘন-ঘন তাহার পিপাসা পাইতেছিল।

উনানের পাশে দাঁড়াইয়া দম-দেওয়া কলের পুতুলের মত কাজ করিতে করিতে এক সময় সে হঠাৎ সচকিত হইয়া উঠানে তাহার স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল। অনুমানে বুঝিল, কলিকাতা হইতে তিনি আসিয়া পৌঁছিলেন। অরুণকে সে অনেক দিন দেখে নাই, একবার ইচ্ছা করিল, ছুটিয়া গিয়া তাহাকে দেখিয়া আসে,—কিন্তু পারিল না।..

ভাবিল, সে তো কলিকাতা হইতে আসিয়াছে! ভুলিয়াও কি সে তাহাদের বাসার দিকে একবারও যায় নাই! পথে কোন দিন নিখিলদা কিংবা কাকাবাবুর সহিত দেখাও তো হইতে পারে!—না জানি, আজ তাহার দিদি তাহাকে কি কথা লিখিয়াছিল, না জানি, কাকাবাবুর

অসুখ কি রকম···তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কি বলিতে পারিবে ? হয় ত জানিলেও বলিবে না !...

উমেশবাবু এবং অরুণ একসঙ্গে খাইতে বসিলেন। গল্প করিবার জন্য তারাসুন্দরীও তাহাদের সঙ্গে আসিলেন। রাণী তখন এদিক-ওদিক করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

ভাতের থালা দুইখানা ধরিয়া দিয়া অসিতা রান্নাঘরের প্রায়ান্ধকার দরজার পাশে গিয়া দাঁড়াইল। সেখান হইতে দরজার ফাঁকে অরুণের মুখখানা দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল,—একদৃষ্টে অসিতা সেই মুখের পানে তাকাইয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কি যেন পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

খাইতে বসিয়া পিতাপুত্রে কথাবার্ত্তা সুরু হইল। অনেক ঘরোয়া কথার মাঝে মাঝে অসিতার কথাও উঠিতেছিল, কিন্তু সে-আলোচনা যে এরূপ নির্ম্মম নিষ্করুণ হইতে পারে, এবং তাহার চোখের সুমুখে এই দুই পরম পুজনীয় গুরুজনের মুখ দিয়া তাহার জন্য যে এত বিষ ঝরিতে পারে, অসিতা প্রথমে তাহা বুঝিতে পারে নাই। ইহা তাহার নিত্য নৈমিত্তিক প্রাপ্য বলিয়া তাহার একটা সান্ত্বনাও ছিল।

উমেশবাবু বলিতেছিলেন, কিন্তু তুই যাই বল্ অরুণ, চোখে দেখে চেনবার জো নেই যে, লোকটা এত বড় পাকা শয়তান্ ! বিয়ের রেতে কি চালটাই না চাল্লে ! বড়লোক,—দূর ! দূর ! ওই আবার বড়লোক রে ! একটা সমাজের ভয় নেই, জাতির ভয় নেই,—ম্লেচ্ছ ! ম্লেচ্ছ !

ভেবেছিলাম, আখেরে আমাদের সুবিধা হতে পারে,—কিন্তু কে জান্‌তো বাবা, ভেতরে ভেতরে শ্রাদ্ধ এতদুর গড়িয়েছে!

অরুণ বলিল, হুঁঃ! নিতান্ত ছোটলোক।

ছোটলোক বলে' ছোটলোক!...বংশটাই খারাপ। মেয়ে ঘরে এনে আমাদের প্রায়শ্চিত্তি কোরতে হয়! না, তাও যদি জানতুম, মেয়েটা ভালো!...এসব অসৎবংশের পরিচয় যে!

অরুণ চুপ করিয়া রহিল।

ক্ষীরোদাসুন্দরী পাশের দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া বসিয়া ছিলেন। এইবার অসিতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, এদের আর-কিছু চাই না মা, এবার তুমি নিজে খেয়ে নিয়ে সকাল-সকাল হেঁসেল্ তুলে দাও। রান্নাঘরটা রানীই ধোবে'খন।

বধুমাতার প্রতি এত অনুগ্রহ শ্বাশুড়ীর যে কেন হইল, অন্য কেহ না বুঝিলেও অসিতা বুঝিল।

তাহাদের খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। উমেশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, ওরা কেউ কোন দিন তোর খোঁজ-খবর নেয়?

অরুণ বলিল, সেই নিখ্‌লেটা দিনকতক এসেছিল। সেদিন আমি তাকে আচ্ছা করে' শুনিয়ে দিয়েচি।

বেশ করেচিস্। বলিয়া উমেশবাবু হাসিয়া উঠিলেন, কিন্তু সে হাসির বিকটতা অসিতার বুকে গিয়া এত জোরে বাজিল যে, সে ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

স্বামী এবং পুত্রকে লইয়া ক্ষীরদা সুন্দরী বড়ঘরে আসিয়া বসিলেন। রাণী তাহাদের পশ্চাতে ঘরে আসিয়া দাঁড়াইতেই উমেশবাবু বলিলেন, আমার কল্‌কেটায় একটু আগুন এনে' দে তো মা! আচ্ছা থাক্‌, থাক্‌, আমিই যাই। বলিয়া হুকা এবং কলিকা হাতে লইয়া তিনি নিজেই বাহির হইয়া গেলেন।

রাণী মায়ের নিকট অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি এবেলাও খা'বে না মা?

ক্ষীরোদাসুন্দরী গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন, না, আমি তো খাব না মা।

অরুণ পাশেই বসিয়া ছিল, বলিল, কেন মা? খাবে না কেন?

এম্‌নিই। খাবার ইচ্ছে নেই—তাই।

রাণী বলিল, বৌ বল্‌চে, তুমি না খেলে সে-ও খাবে না।

ক্ষীরোদা এইবার মুখখানা একটুখানি বিকৃত করিয়া কহিলেন, সে আবার কি আব্দার মা? খাব না, সে না হয় আজ অরুণ এসেচে বলেই বল্‌চে, কিন্তু এতই যদি সোয়ামীকে ভয়, তাহ'লে আজ সকালের কাণ্ডটি না কোরলেই হতো!

অরুণ সরোষে জিজ্ঞাসা করিল, কি কাণ্ড?

না বাবা, তোর আর শুনে' কাজ নেই। ও ডাকাত মেয়ে চিরকাল যা করে আস্‌ছে, তাই করেছে,—এ আর শুনে' কি হবে?

রাণী আর থাকিতে পারিল না। বলিয়া দিল, মাকে বৌ আজ মেরেছে। মা তাই সারা দিন কিচ্ছু খায়নি।

কথাটা শুনিবামাত্র স্বামীত্বের এবং প্রভুত্বের মর্য্যাদা সজাগ হইয়া উঠিতেই অরুণের মাথায় খুন চড়িয়া গেল। চোখ দুইটা বিস্ফারিত করিয়া বলিল, কি? মেরেছে? আচ্ছা দাঁড়াও। বলিয়া আর কাহাকেও কিছু বলিবার অবসর না দিয়া সে দুপ্‌ দুপ্‌ করিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল।

ক্ষীরোদাসুন্দরী মুখে একবার নাম মাত্র বারণ করিয়া রাণীকে বলিলেন, দ্যাখ্‌ মা, আবার কি কোরে বোস্‌বে। আমি জানি! ও তা সইতে পারবে কেন?

অরুণ রান্নাঘরে প্রবেশ করিতেই সম্মুখে তাহার পিতাকে দেখিয়া সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। দেখিল, তিনি চিম্‌টা দিয়া উনান হইতে আগুন বাহির করিয়া কলিকায় চড়াইতেছেন!

কাজে কিছু করিতে না পাইয়া অরুণ রাগে গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে মায়ের কাছে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তুমিও আচ্ছা করে' শিখিয়ে দিতে পারলে না? তার—

ক্ষীরোদাসুন্দরী কথাটা তাহাকে শেষ করিতে না দিয়াই তাহার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া কহিলেন, চুপ্‌! চুপ কর্‌ বাবা! ও লজ্জার কথা আর চেঁচিয়ে বলিস্‌নে। কেলেঙ্কারীর বাকী আর কিছু নেই।

অরুণ বসিয়া পড়িয়া বলিল, বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে। আমি

হাজার দিন বলেচি, ওকে পাঠিয়ে দাও, পাঠিয়ে দাও,—তা, তোমরা তো শুন্‌বে না !

পাঠিয়ে দাও বল্‌লেই কি আর পাঠিয়ে দেব অরুণ ? ভেবেছিলুম, শহরের মেয়ে,—অমন একটু-আধটু খিটির্‌-মিটির্‌ করে বৈ কি ! কিন্তু বাছা, রয়ে সয়ে দেখ্‌লুম অনেক। মেয়ে দিন-দিন যেন লেজে দাঁড়াচ্চে। —এইবার তোরা যা খুশী তাই কর্‌ বাবা, আমি আর পারিনে।

শহরের মেয়ে—। বলিয়া অরুণ বোধ করি তাহাদের জাতির উপর আরও দোষারোপ করিতে যাইতেছিল। উমেশবাবু বাহিরে দাঁড়াইয়া ইহাদের মন্তব্য কিছু-কিছু শুনিয়াছিলেন। তামাকের কলি-কায় ফুঁ দিতে দিতে সহসা ঘরে প্রবেশ করিয়াই বলিয়া উঠিলেন, আর শহুরে' মেয়ে নয় বাবা ! নন্দীগাঁয়ের জমিদারের মেয়ে ! কুটুম স্থাথ কেমন ?···কেউ কোন দিন আশাও করেনি। চালাকি বাবা ! লেখা-পড়ার দাম কে দেবে ? বলিয়াই কসিয়া একবার হুঁকায় দম্‌টা টানিয়া লইয়া একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া দিলেন। বলিলেন, উমেশ মুখুজ্যে একবার বই হু'বার ঠেক্‌বে না,—এ কথা ঠিক্‌।

রান্নাঘরের দরজা হইতে রাণী ডাকিল, মা, খাবে এসো।

অরুণ বলিল, যাও মা যাও।

উমেশবাবু বলিলেন, যাও গো যাও। খেয়ে নাও গে। ওটার উপর মিছে রাগ করলে কি হবে ? ওটা কি ছাই মানুষ, যে বুঝ্‌বে ?··

ক্ষীরোদাসুন্দরী আর-কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া উঠিয়া গেলেন।

উমেশবাবু এইবার অরুণের কাছে সরিয়া আসিয়া চুপি চুপি বলিলেন, ভেল্কি লাগিয়ে দেব। ছ্যাখ্, গাঁয়ের লোক সব থ' হয়ে যাবে! ...তুই ছেলেমানুষ, বুঝ্‌তে পারচিস্ না অরুণ! বৌমার উপর রাগা-রাগি মারামারি করে' শত্রু হাসাস্ নে! চুপটি করে' কাল বিদেয় করে' দে। সেও জান্‌বে, কাকার অসুখ বলে চল্‌লো। কেলেঙ্কারী করে' পাঠাতে আমরা যাব কেন? সৌজন্য করেই পাঠাব।

আবার গোটাকতক টান দিয়া কহিলেন, একটি কথাও তাকে শুনিয়ে কাজ নেই। বিশ্বাস কি,—সে শয়তান মেয়ে হয়ত' জব্দ করবার জন্যে মাটি কাম্‌ড়ে' পড়ে' থাক্‌বে,—হয়ত বা যেতে বল্‌লেও নড়তে চাইবে না!...তুই তাকে কলকাতায় রেখে' আস্‌তে পারবি তো?

অরুণ ঈষৎ ভাবিয়া বলিলে, আমি ঝগ্‌ড়া করে' যখন এসেছি, তখন নিজে আর সেখানে যাব না। অমূল্যকে সঙ্গে নিয়ে গেলেই হবে। ষ্টেশন থেকে সেই পৌঁছিয়ে দিয়ে আস্‌বে।

অমূল্য তাহারই দূর-সম্পর্কের এক পিসির ছেলে।

উমেশবাবু বলিলেন, কে? আমাদের এই অমূল্য? তা বেশ।

রাত্রি তখন কত হইবে কে জানে! অসিতা যখন উপরে উঠিয়া গেল, অরুণ তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। অসিতা একবার ভাবিল, অনেকখানি পথ হাঁটিয়া আসিয়া বোধ করি তাহার ক্লান্তি হইয়াছে,—

এখন আর তাহাকে জাগাইয়া কাজ নাই! অনেকক্ষণ ধরিয়া অসিতা তাহার পায়ের তলায় বসিয়া অরুণের মুখের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। এ ঘুমন্ত মুখের উপর কুটিলতা বা ক্রূরতার কোন চিহ্নই তো নাই! তবে সে জাগিয়া উঠিলে এমন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মানুষ হইয়া যায় কেন?...আজ কোন্ অস্ত্র যে তাহার উপর নিক্ষিপ্ত হইবার জন্য উদ্যত হইয়া আছে, অসিতা তাহার কিছুই জানে না! হয় ত' সত্য মিথ্যা অনেক অপবাদ অতিরঞ্জিত হইয়া আজ তাহার স্বামী আসিতে-না-আসিতেই তাহার কাণে গিয়া পৌঁছিয়াছে। ভবিষ্যতের ভয়ে ভাবনায় অসিতার বুকখানা দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। অরুণের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিতে করিতে অসিতার চঞ্চল দৃষ্টি সহসা তাহার পদদ্বয়ের উপর স্থির-নিবদ্ধ হইয়া গেল। সে জানে, নারীর যত কিছু দুঃখ-দুর্ভাবনা স্বামীর এই দুটি চরণের তলেই ত' নিবৃত্তির পথ খুঁজিয়া পায়! দুনিয়ায় নারীর জন্য যত আশ্রয়ই থাকুক্ না কেন, ইহা অপেক্ষা নির্ভয় নিরাপদ আশ্রয় বুঝি তাহাদের আর কোথাও নাই!...কিন্তু মনে জানিলেই যদি কাজে হইত, তাহা হইলে কোন ভাবনা ছিল না!...সে তো শুধু আজ বলিয়া নয়, কত দিন কত বিপদের মুহূর্ত্তে,—কত আসন্ন প্রলয়ের ভয়ে, কত আশা-ভরসায় বুক বাঁধিয়া সে যতবার তাহার এই পদদ্বয় বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছে, ততবারই সে পদাহত হইয়া ফিরিয়া গেছে! যতবার সে তাহার অপরিমেয় ভালবাসা এই চরণের তলে উৎসর্গ করিয়া দিয়া মাত্র একটুকু করুণার প্রার্থনা করিয়াছে, ততবার সে ঘৃণাহতা হইয়া

মুখ ফিরাইয়াছে।—বিনিময়ে শুধু নিদারুণ লাঞ্ছনা ব্যতীত সে আর কিছুই পায় নাই। বুক চিরিয়া দেখাইবার হইলে সে আজ দেখাইতে পারিত, তাহার নিষ্কলঙ্ক প্রেমের বুকে এই দুটি পায়ের আঘাত-চিহ্ন কিরূপ নিষ্করুণ ভাবে ফুটিয়া আছে!...অসিতা ভাবিতেছিল, ইচ্ছা করিলে এই লোকটিই তো তাহার হাতে স্বর্গ আনিয়া দিতে পারিত! একটা জীবন এমন করিয়া ব্যর্থ নিষ্পেষিত করিয়া দিবার কি প্রয়োজন ছিল তার? —অসিতার ভালবাসা যাহার নিকট বারে-বারে অপমানিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, ইচ্ছা করিলেই সে তো আর তাহাকে ভালবাসিতে পারে না! দুর্জ্জয় অভিমানে যে মুখ ফিরাইয়াছে,—চোখের জলে যাহাকে বিদায় করিয়াছে, শুধু কথার ছলে তাহাকে তো ফিরানো যায় না!

অশ্রুর আবেগে অসিতার কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিতেছিল। তরঙ্গায়িত জলধির উন্মত্ত বিক্ষোভ সে আর বুকের নিচে অধিকক্ষণ চাপিয়া রাখিতে পারিল না। বিছানার একপার্শ্বে উপুড় হইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া সে কাঁদিতে লাগিল!...

প্রতি দিনের অভ্যাসমত সেদিনও শেষরাত্রে অসিতার ঘুম ভাঙিল। দেখিল, সে শয্যার একপ্রান্তে কোনরকমে রাত্রি কাটাইয়াছে!

অরুণ তখনও নিশ্চেষ্ট ভাবে নিদ্রা যাইতেছিল। অসিতার চোখ দুইটা রাত্রির এত বর্ষণেও ক্ষান্ত হয় নাই, আবার টলমল্ করিয়া উঠিল! যেমন আসিয়াছিল, তেমনি ধীরে-ধীরে সে চলিয়া গেল।

পরদিন ইন্দ্রনাথের বোধ করি নেশা ছুটিয়াছিল। দুপুর বেলা তাঁহার এক বেহারা আসিয়া চন্দ্রনাথের হাতে ত্রিশটি টাকা দিয়া বলিল, সাহেব পাঠিয়ে দিলেন। দারুণ অভিমানে চন্দ্রনাথ মনে-মনেই ফুলিতেছিল। টাকাগুলা বেহারার পায়ের কাছে ছুড়িয়া দিয়া বলিল, বেরো বল্‌চি হারামজাদা আমার বাড়ী থেকে। টাকা দেখাতে এসেচেন, টাকা! টাকা তোর সাহেবকে ফিরিয়ে দিগে যা। বল্‌গে, তার নিজের মেয়ে উপোস্ দিয়ে মর্‌বে, আমার তাতে কি বয়ে যাবে? যা, তুই টাকা নিয়ে সরে' পড়্, যা বেরো!

বেহারা ফিরিয়া যাইতেছিল, চন্দ্রনাথ পুনরায় দরজার বাহিরে আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া বলিল, শোন্!

সে ফিরিয়া দাঁড়াইতেই চন্দ্রনাথ কহিল, অতসব বলে' কাজ নেই তোর,—বুঝ্‌লি? বল্‌বি, টাকা সে ফিরিয়ে দিলে, নিলে না।

বেহারা চলিয়া গেল। চন্দ্রনাথের মনে হইল, রাগের ঝোঁকে সামান্য একটা ভৃত্যের সম্মুখে তাহার নিজের ঘরের কথাগুলা না বলাই উচিত ছিল। সে হয়ত' সব জানিয়া গেল!

একটা চাক্‌রী জোগাড় করিতে চন্দ্রনাথের বিলম্ব হইল না। দিনকতক পরে, পঞ্চাশ টাকা বেতনে সে একটা বাঙ্গালী কোম্পানীর অফিসে ঢুকিয়া পড়িল।

অফিসে কাজ করিতে আসিয়া তাহার এক হিতৈষী সুহৃদ্ মিলিয়া গেল। বয়সে অনেক ছোট হইলেও অতি অল্প দিনের মধ্যেই নিখিল

প্রাতে অসিতা সকলের চা তৈরী করিতেছে, এমন সময় রাণী সহসা তাহার নিকট একটা সংবাদ বহন করিয়া আনিল। বলিল, হ্যাঁ বৌ, তোমার কাকার না কি অসুখ? তুমি না কি আজ দাদার সঙ্গে কলকাতা যাবে?

রাণীকে সে বেশ বিশ্বাস করিতে পারিত না। তথাপি আগ্রহাকুলচিত্তে জিজ্ঞাসা করিল, কে বল্লে ঠাকুরঝি?

ঠোঁট উল্টাইয়া একরকম বিশ্রী মুখভঙ্গি করিয়া রাণী বলিল, আ, ন্যাকামি দেখ্‌লে কি হয়! বাবা, মা, দাদা, সবাই বলচে, আর উনি জানেন না?

সত্যি ভাই জানি না। পাগল হয়েছ তুমি? আমি কোথায় যাব?

উমেশবাবু হুঁকাটা হাতে লইয়া সেই দিকেই আসিতেছিলেন। অসিতার কথাগুলা শুনিতে পাইয়া বলিলেন, কাকার অসুখ, লিখেচে যখন, তখন একবার ফিরেই এসো। পাঁজিটাও দেখ্‌লুম,—বারোটার আগেই বেরিয়ে যেতে হয় তাহ'লে। অরুণের সঙ্গেই যাও, আবার বুড়ো হাবড়া মানুষ, হঠাৎ কোন কিছু হয়ে গেলে—। রাণু, বারোটার আগে ওদের আজ খাইয়ে দিতে হবে মা। তোর দাদা, অমূল্য আর বৌ।

বৌ গেল, গেল,—হাঁড়ি ধরিবার কাজটা আজ হইতে তাহারই স্কন্ধে চড়াইয়া গেল দেখিয়া রাণী একটুখানি অসন্তুষ্ট হইল, কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ না করিয়া ঘাড় নাড়িয়া উমেশবাবুর কথায় সায় দিয়া বলিল, বেশ।

তাহার উপর বাড়ীর সকলেরই আজ অতিরিক্ত সহৃদয়তা এবং এই অপ্রত্যাশিত অভাবনীয় পরিবর্ত্তন দেখিয়া সত্য-মিথ্যা অসিতা প্রথমে কিছুই ঠাহর করিতে পারিল না।

কিন্তু দ্বিপ্রহরের একটুখানি পূর্ব্বেই অরুণের উচ্ছিষ্ট পাত্রে যৎ-সামান্য আহার করিয়া ষ্টেশনে যাইবার জন্য অসিতা যখন গরুর গাড়ীতে উঠিয়া বসিল, তখন তাহার আশা হইল। এত দিন ধরিয়া এখানের এই এতগুলি প্রাণীর নিষ্ঠুর নির্দ্দয়তার নিদর্শন দেখিয়া দেখিয়া তাহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ইহাদের দয়া, ধর্ম্ম কিছুই নাই। আজ সেই সনাতন বিধির এতটুকু ব্যতিক্রম দেখিবাই অসিতার মন কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল!...এই সহজ সত্যের গোপন অন্তরালে কোথাও কোন মিথ্যা অভিসন্ধি লুকাইয়া আছে কি না,—এবং যদিও না থাকা অপেক্ষা সে বস্তু থাকিবার সম্ভাবনাই এখানে সব চেয়ে বেশী,—তথাপি সে সংবাদ জানিবার কোন কৌতূহল, আজ তাহার মনে নিমেষের জন্যও জাগিল না। ষ্টেশনের মুখে গাড়ী ছাড়িয়া দিতেই অসিতা বরং ভগবানের কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিল, হোক্ স্বামীর ভিটা, তথাপি আর তাহাকে যেন কখনও না আসিতে হয়!...

১৯

চন্দ্রনাথের শরীর একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। দেখিলে মনে হইত, প্রৌঢ় অবস্থাতেই যেন তাহার বার্দ্ধক্য আসিয়াছে! জ্বর তাহার প্রায়ই মাঝে-মাঝে হয়। সেদিনও আবার জ্বর আসিল। জ্বর সামান্য হইলেও, জ্বরের ঘোরে প্রলাপ তাহার সামান্য কোন দিনই হয় না,—চীৎকারের চোটে বাড়ীর লোক শশব্যস্ত হইয়া ওঠে। আবার ডাক্তার আসিল। আবার সকলের রাত্রি জাগিবার পালা পড়িল।

সেদিন রাত্রির অন্ধকার তখন থম্-থম্ করিতেছে। একে' ত' যে-রাস্তাটায় তাহাদের বাড়ী, সেখানে সন্ধ্যারাত্রি হইতেই লোক চলাচল একপ্রকার হয় না বলিলেই হয়, তাহার উপর রাত্রির গভীরতার সঙ্গে-সঙ্গে, পাশাপাশি বাড়ীগুলা পর্য্যন্ত নিঝ্ঝুম্ হইয়া পড়িয়াছে! চন্দ্রনাথ রোগশয্যায় শুইয়া অসংবদ্ধ প্রলাপ বকিতেছিল। নিখিল শিয়রের কাছে বসিয়া রাত্রি জাগিতেছে। সুচিত্রা এবং অসিতা পাশের ঘরে শুইয়াছিল বটে, কিন্তু ঘুমাইতে পারে নাই,—মাঝে মাঝে উঠিয়া আসিয়া রোগীর খবর লইতেছিল।

চন্দ্রনাথ বলিল, কি জানি বাবা, কখনও মনে হয় অদৃষ্টের দোষ, কখনও মনে হয় তার কপালের দোষ!...শ্বশুরবাড়ী থেকে মেয়েটার কি চেহারা হয়েছে দেখেছ নিখিল? মা আমার কি ছিল, আর কি হয়ে গেছে!

নিখিল তাহা জানে এবং এ-বিষয়ে তাহারও ভাবনা অন্যান্য কাহারও অপেক্ষা কম ছিল না। সে সর্ব্বদাই ভাবিতেছিল, তাহারই নির্ব্বুদ্ধিতার দোষে হয়ত' এ কাণ্ডটি ঘটিয়াছে। ইহাতে দোষ যে তাহারই সকলের চেয়ে বেশী! সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হুঁ।

চন্দ্রনাথ আবার বলিয়া উঠিল, হুঁ নয় বাবা, শুধু হুঁ নয়! আর আমি কখ্খনো তাকে পাঠাচ্ছি না। নিতে এলেও না। সেও বরং আমার সুচিত্রার মতই—

কথাটা সে আর শেষ করিতে পারিল না, হঠাৎ কোথায় যেন নিদারুণভাবে আহত হইয়া উর্দ্ধে কড়িকাঠের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে সে আবার বলিতে লাগিল, মানুষের কখন্ যে কি হয়, কেউ তা বল্‌তে পারে না বাবা! এই যে আলোটা জ্বল্‌ছে, বল্‌তে পার কখন এটা নিব্‌বে? আর এই যে আমি আজ বেঁচে রয়েছি, কবে যে মর্‌বো বল্‌তে পারি না। তবে দিন যে আমার ঘনিয়ে এসেছে, এ কথা ঠিক্। নিখিল!

বলিয়া চন্দ্রনাথ হঠাৎ একবার তাহার মুখের পানে তাকাইয়া কহিল, আমি তো চল্‌লুম বাবা! গলার স্বর তাহার কাঁপিয়া উঠিল। ঠোঁট দুইটা কাঁপিতে লাগিল। চোখের কালো তারা দুইটা কাঁপিতে কাঁপিতে অশ্রুজলে ধূসর হইয়া গেল। অতি কষ্টে ঢোঁক্ গিলিয়া উচ্ছ্বাস থামাইয়া আবার বলিল, কিন্তু মরণ চাইবারও তো আমার অধিকার নেই

বাবা! অঋণী হয়েও যেতে পারলুম না,—আর, কাকে যে কোথায় রেখে' যাচ্ছি,—সুচিত্রা! অসিতা! মা গো! তোদের অদৃষ্ট মা! হ্যাঁ, হ্যাঁ, শোন,—আর একটা কথা। কাল তুমি একবার যাও। দাদার কাছে যাও। বল্‌বে, ভাইটা তো তোমার ফর্সা হয়ে গেল। এইবার তোমার মেয়ে তুমি দেখে' নাও বাপু! ঋণের কথাটাও বলো। সেও তো আমি ইচ্ছে করে' করিনি! তারই মেয়ের বিয়েতে খরচ করে' দিয়েছি। কিন্তু দুর ছাই! খরচ করেও তো কিছু হলো না রে! অসিতা আমার! মা!...আচ্ছা নিখিল, তোমার কি মনে হয় বাবা, আমি কাল পর্য্যন্ত বাঁচবো?

নিখিল বলিল, আপনি ঘুমোন্‌ কাকাবাবু। একবার একটুখানি জ্বর হয়েছে, কি আর নিস্তার নেই। নিজেও ঘুমোবেন না আর বাড়ী-সুদ্ধ কাউকে ঘুমোতেও দেবেন না!

হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাও বাবা যাও। তুমি এবার ঘুমোও গে। এই আমি চুপ কর্‌লুম,—আর কথাটি কয়েছি কি···ক'টা বাজ্‌লো? ঘড়িটা তো এখান থেকে আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

নিখিল দেওয়ালের ঘড়িটার পানে তাকাইয়া বলিল, একটা বাজ্‌লো কাকাবাবু। আপনি না ঘুমোলে আমি উঠ্‌চি না।

আচ্ছা বেশ। বলিয়া চন্দ্রনাথ মিনিট খানেক চোখ বুজিয়া রহিল। পরে, আবার কহিল, কই, তুমি এখনও গেলে না যে বাবা? ঘুম আমার হবে না, তুমি যাও। দাদাকে একবার বড় দেখ্‌বার ইচ্ছে

হয় নিখিল! যাবার বেলা সে কি একবার পায়ের ধুলো দেবে না বাবা? বলিয়া সে তাহার অশ্রুপূর্ণ চক্ষু দুইটি তুলিয়া একবার নিখিলের পানে বড় সকরুণ দৃষ্টিতে চাহিল।

আপনি চুপ করুন। বলিয়া নিখিল তাহার গায়ের লেপখানা ভাল করিয়া টানিয়া দিল।

এমন সময় দরজা ঠেলিয়া ধীরে-ধীরে অসিতা ঘরে প্রবেশ করিল। নিখিলের কাছে সরিয়া আসিয়া তাহার কাণের নিকট মুখ লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেমন আছেন? ঘুমিয়েছিলেন?

নিখিল বলিল, না ঘুমোন্‌নি।

চন্দ্রনাথ চোখ মেলিয়া বলিল, কে?

নিখিল বলিয়া দিল, অসিতা।

অ্যাঁ! তুই এখনও ঘুমোস্‌নি মা! এই রোগা শরীর নিয়ে জেগে আছিস্? বলিয়া চন্দ্রনাথ তাহার শীর্ণ হাতখানা প্রসারিত করিয়া অসিতার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, আয় মা, বোস্,—দুটো কথা কই! তোর এই মুখখানি কত দিন দেখিনি মা, বল্ তো?···নিখিল, তুমি এবার ঘুমোও। অসিতার সঙ্গে কথা বল্‌তে বল্‌তে আমি ঘুমিয়ে পড়ি।

নিখিল ধীরে ধীরে উঠিয়া মেঝের উপর তাহার নিজের বিছানায় গিয়া বসিল। অসিতা কাকাবাবুর পাশে বসিয়া তাহার হাতের উপর হাত বুলাইতে লাগিল।

অসিতার চিবুক ধরিয়া চন্দ্রনাথ বলিল, তোকে অসুখের খবর দিইনি-

বলে' রাগ করেচিস্ মা ? কি কোরব মা, তুই তো আস্‌তে পারতিস্ না, সেখানে বসে' বসে' ভাব্‌তিস্। তবে, মরে যাওয়ার মত হলে' খবর দিতুম বই কি !

অসিতা হেঁটমুখে বসিয়া রহিল।

সে আবার বলিল, ত্মাখ্ দেখি মা, তুই কেমন রোগা হয়ে গেছিস। চোখ দুটো বসে' গেছে যে মা ! হ্যাঁ রে, তোকে কি খুব কাজ কোরতে হতো ? অসুখ-বিসুখ করেছিল নিশ্চয়।

অসিতা বলিল, না কাকাবাবু। আমার তো কিচ্ছু হয় নি।

হঁ্যা, হয় নি ? তোর অমন চেহারা, তা না হলে কি আর এমন হয় রে ক্ষেপী ? শ্বশুর, শাশুড়ী, বেশ ভালবাস্‌তো ?...আর অরুণ ?...

অসিতা লজ্জায় কথা বলিতে পারিতেছিল না !...

চন্দ্রনাথ বলিল, লজ্জা কি মা ? বল্‌তে দোষ কি ? হ্যাঁ রে ? বলিয়া কাকাবাবু আর একবার তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিল।

অসিতা কি বলিবে ? যে-নির্য্যাতনের কথা ভাবিলে আজিও সে শঙ্কায় শিহরিয়া উঠিতেছে, যাহাদের ভালবাসার নিদর্শন তাহার সর্ব্বাঙ্গে জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে, তাহাদের কথা মুখে বলিবার ত' কিছুই নাই ! তবু যেন কথাটা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। বলিল, ভালবাস্‌বে না কেন ? বাস্‌তো।

তবে কেন এমন হয়ে গেলি মা ? আর তোকে আমি এখন যেতে দেব না।

অসিতা কাকাবাবুর হাতখানা একবার জোরে চাপিয়া ধরিল। শুধু এখন কেন, সে আর কখনও সেখানে যাইবে না।...কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছুই তাহার বলা হইল না। মিনতি-কাতর সকরুণ দৃষ্টিতে কাকাবাবুর মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

ঘড়িতে টং টং করিয়া দুইটা বাজিয়া গেল। চন্দ্রনাথ বলিল, না মা, তোর রোগা শরীর, তুই ঘুমোগে যা। আমি এখন বেশ ভালোই আছি। এইবার একটুখানি ঘুমোবার চেষ্টা করি। যা মা, যা। বলিয়া অসিতাকে একপ্রকার জোর করিয়াই সেখান হইতে তুলিয়া দিয়া, চোখ বুজিয়া চন্দ্রনাথ ঘুমাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে লাগিল।

২০

ভিতরে ভিতরে ইন্দ্রনাথের যে অনেকখানি পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তিনি মুখে কিছু না বলিলেও, মতিলাল তাহা জানিত এবং সেইজন্যই সে প্রায়ই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত, আপনার মেয়েদের এখানে আন্‌বো কি বাবু ?

ইন্দ্রনাথের যে ইহাতে অনিচ্ছা ছিল তাহা নয়, তবে এত দিন ধরিয়া তিনি যাহাদের উপর অন্যায় অবিচার করিয়া আসিয়াছেন, হঠাৎ তাহাদিগকে চোখের সুমুখে আনতে তাঁহার কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হইত। তাই সময় সময় তিনি কোনও উত্তর না দিয়াই চুপ করিয়া থাকিতেন, আবার কখনও কখনও মতিলালকে তিরস্কার করিয়া তাড়াইয়া দিতেন।

কলিকাতায় এমন নিরবলম্ব হইয়া বসিয়া থাকিতে ইন্দ্রনাথের ভালো লাগিতেছিল না ; তাই তিনি সেদিন তাঁহার এক বন্ধুর সহিত দিন কতকের জন্য এলাহাবাদে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় মতিলালকে জানাইয়া গেলেন যে, ফিরিতে তাঁহার সপ্তাহ-খানেক দেরী হইবে।

ইত্যবসরে মতিলাল এক বুদ্ধি ঠাওরাইল। সেদিন সকালে নিজে ইটালি গিয়া চন্দ্রনাথ, নিখিল, সুচিত্রা এবং অসিতাকে পার্ক ষ্ট্রীটের বাড়ীতে লইয়া আসিল। চন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলে তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে, তাহার দাদা তাহাদিগকে আনিতে বলিয়া এলাহাবাদে গিয়াছেন, দিনকতক পরেই ফিরিবেন।

চার পাঁচ দিন পার হইয়া গেল, ইন্দ্রনাথ এলাহাবাদ হইতে ফিরিলেন না দেখিয়া. সেদিন প্রাতে চন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিল, দাদা আমাদের এখানে আন্‌তে বলেছিল ত' মতিলাল ?

তা নইলে কি আমি নিজের ইচ্ছায় নিয়ে এসেছি ছোটবাবু ? ভয় কি ? এও তো আপনাদের ঘর।

চন্দ্রনাথ বলিল, না, না, তা বলছি না মতিলাল, তবে, আমার দাদাকে তো আমি চিরকাল চিনি,—একটুতেই হট্ করে' রেগে ওঠেন, তাই জিজ্ঞেস করছিলুম—

মতিলাল বলিয়া উঠিল, আপনার সে দাদা আর নেই ছোটবাবু, বিষদাঁত এখন ভেঙ্গে গেছে। আমি থাক্‌তে তাড়াতে পারবেন না, সে ভয় আপনাদের নেই।

এমন সময় উপর হইতে সুচিত্রা ডাকিল, মতিলাল !

যাই মা। বলিয়া মতিলাল তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া গেল।

একখানা ড্রেসিং টেবিলের এক মাথায় ধরিয়া সুচিত্রা টানাটানি করিতেছিল। মতিলাল বলিল, ওটা কি এ ঘরে থাক্‌বে না মা ?

না। ধর ত'—দুজনে ও ঘরে নিয়ে যাই। বলিয়া নিজে এক পাশে ধরিয়া মতিলালকে অপর পার্শ্বে ধরিতে ইঙ্গিত করিল।

মতিলালের কঙ্কালসার শরীরেও এই কয়েক দিনের মধ্যেই যেন অপর্য্যাপ্ত শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল।

টেবিলখানা দুজনে ধরাধরি করিয়া পাশের ঘরে আনিল।

যেন তাহাদের একান্ত আপনার জন হইয়া পড়িল। গৃহহারা ছন্নছাড়া এই নিখিলের মা, বাপ, ভাই, বোন, এমন কি, দূর সম্পর্কের কোন আত্মীয় বান্ধব, কেহ কোথাও নাই। কলিকাতার একটা মেসে থাকিয়া সেও কিছুদিন হইল, সেই কোম্পানীর অফিসেই চাকুরী করিতে ঢুকিয়াছে।

মতিলাল কহিল, সেইজন্যই তো বলেছিলুম মা, অন্ততঃ চারটে চাকর রেখে বাকীগুলো বিদেয় করলে হতো,—একটা চাকরে তো সব দিক দেখ্‌তে পারে না ?

তা জানি মতিলাল, কিন্তু যে কাজ আমরা নিজেরাই পারি, সে কাজে অন্যের সাহায্য নেওয়া ভাল দেখায় না। আর অনর্থক মাসে-মাসে এত খরচ করবারও ত' প্রয়োজন দেখিনে। একজন চাকরেই সব কাজ কোরবে দেখো।

এই কয়েকটা দিনের মধ্যেই বাড়ীর একটা স্বতন্ত্র রূপ ফিরিয়াছিল। মতিলাল তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, এতগুলা দাসী চাকর রেখেও তো কই এ রকমটি আমরা করতে পারিনি মা!

তোমরা করেছ ছাই। ঘরের যেখানে-সেখানে হাজার দু-হাজার বোতল জড় করে' রেখেছ, আর গিলেছ। বলিয়া গম্ভীরভাবে সুচিত্রা আর একটা ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোদের কি আর মশারি খাটানো হবে না অসিতা?

ড্রেসিং টেবিলটার পাশে এখনও যে বোতলটা মেঝের উপর গড়াইতেছিল, সুচিত্রা বোধ করি সেইটা দেখিয়াই এই কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিল।

মতিলাল লজ্জায় মরিয়া গেল। সুচিত্রা চলিয়া গেলে খানিকটা জিব বাহির করিয়া তাড়াতাড়ি সেই বোতলটা কাপড়ের নিচে লুকাইয়া লইয়া অপরাধীর মত সেখান হইতে সে দ্রুতপদে পলায়ন করিল।

অসিতা ও নিখিল একটা বড় খাটে মশারি খাটাইবার জন্য এ ঘরে আসিয়াছিল। নিখিলকে দেখিতে না পাইয়া সুচিত্রা কহিল, আর তিনি কোথায় গেলেন?

ওই যে ও-ঘরে ঢুকেচেন। বলিয়া অসিতা পাশের দরজার পর্দ্দাটার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দিল।

তিনি বুঝি আর পারলেন না।

অসিতা বলিল, পারবে না কেন? এতক্ষণ বসে' বসে' গল্প করে' উঠে' চলে গেল।

সুচিত্রা জিজ্ঞাসা করিল, কি গল্প রে?

অসিতা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, দেখ ত' দিদি, এতে রাগ হয় না? আমি কত দিন শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছি বল ত? এতদিন তার একটা কথাও জিজ্ঞেস করবার অবসর হলো না, আর আজ বল্‌ছে কি জান? তোর শ্বশুর তোকে কেমন ভালবাস্‌তো রে! শাশুড়ীটা খাটিয়ে খাটিয়ে তোর দম বের করে দিত, নয়?—আমিই বা এত দিন পরে বলবো কেন, বল ত দিদি?

ও! তাই বুঝি রাগ হয়েছে।—তা বাপু এত দিন পরে খোঁজ খবর নিলে মেয়েদের রাগ হয়। বলিতে বলিতে যে ঘরে নিখিল ঢুকিয়াছিল, দরজার পর্দ্দাটা সরাইয়া সুচিত্রাও সেই ঘরে প্রবেশ করিল। দেখিল, জানালার কাছে একটা চেয়ারে বসিয়া, সুমুখে টেবিলের উপর মাথা গুঁজিয়া নিখিল চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

সুচিত্রার আগমন সে টের পায় নাই ; কাছে আসিয়া সুচিত্রা গলার আওয়াজ করিতেই, নিখিল মুখ তুলিয়া তাহার মুখের পানে তাকাইল। কোন কথা বলিল না।

সুচিত্রা জিজ্ঞাসা করিল, আবার কি সেই কথাটাই ভাবচো না কি ?

নিখিল বলিল, না। এবার আর অসিতার কথা ভাবিনি, আর একটা নূতন কথা ভাব্‌চি।

নূতন ভাবনাটা কি শুনি ?

সব কথাই কি তোমায় বল্‌তে হবে ?

অন্ততঃ আমার তাই মনে হয়।

তাই ভাব্‌চি, তোমায় বলব কি না।

সুচিত্রা হাসিয়া বলিল, আচ্ছা, আমি অনুমতি দিচ্ছি, বল।

নির্ভয়ে ?

হ্যাঁ, নির্ভয়ে।

নিখিল একবার সুচিত্রার মুখের পানে তাকাইয়া দৃষ্টি অবনত করিল।

বল, চুপ করলে যে ?

বলি। বলিয়া একটা ঢোঁক্‌ গিয়া নিখিল বলিল, দেখ সুচিত্রা, আমি আর এখানে থাক্‌বো না। আমায় ছুটি দাও।

কথাটা সুচিত্রা বেশ বিশ্বাস করিতে পারিল না ; বলিল, তুমি চাকুরিই না করলে কবে যে, ছুটি দেব।

হাসি নয় সুচিত্রা! সত্যি বলচি, আমি যাব।

বেশ তো। ধরে' রাখ্‌তে তো পারি না! বলিয়া সুচিত্রা গম্ভীর ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

নিখিল আর একবার মুখ তুলিয়া তাহার মুখের পানে তাকাইল; কিন্তু সে মিনতি-কাতর কালো চোখ দুইটির পানে সে তাকাইয়া থাকিতে পারিল না।

তুমিও যে এক দিন চলে যাবে, তা কি আর আমি জানি না! বলিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সুচিত্রা বাহির হইয়া গেল।

নিখিল একবার পিছন্ ফিরিয়া তাকাইল, কিন্তু সুচিত্রা ফিরিল না দেখিয়া, সে জানালার বাহিরে আকাশের পানে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ একদৃষ্টে বসিয়া থাকার পর, নিখিলের চোখের দৃষ্টি আপনা হইতেই ঝাপ্‌সা হইয়া আসিতে লাগিল।...

সাত দিনের পর সেদিন শনিবার সন্ধ্যায় ইন্দ্রনাথ এলাহাবাদ হইতে ফিরিলেন। দরজায় মোটর হইতে নামিয়াই দেখিলেন, সমস্ত বাড়ীটা গম্‌-গম্‌ করিতেছে, উন্মুক্ত দরজা-জানালার পথে নূতন পর্দ্দার ভিতর দিয়া আলোর ছটা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে! এ যেন কেমন এক অভিনব রূপে সমস্ত বাড়ীটা ফুটিয়া উঠিয়াছে! যে কথাটা তিনি গত কয়েক মাস ধরিয়া অহোরাত্র চিন্তা করিয়াছেন, আজ তাহাই হইল না তো? তাঁহার অবর্ত্তমানে মতিলাল কি তাঁহার মেয়েদের এখানে লইয়া আসিল! কথাটা খুব সত্য এবং সহজ হইলেও তিনি যেন তাহা ধারণা করিতে পারিতেছিলেন না। অথচ তাহা ভিন্ন এ যে আর কিছুই হইতে পারে না, সে কথাটাও তিনি মনে-মনে বেশ বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার রাগ হইতেছিল মতিলালের উপর সব চেয়ে বেশী। ফটক পার হইয়া উঠান হইতে জোরে-জোরে হাঁকিলেন, মতে'! ম'তে।

রান্নাঘরে বসিয়া সুচিত্রা পাচক ব্রাহ্মণকে রান্না শিখাইতেছিল। মতিলাল চৌকাঠের নিকট দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিতেছিল। সহসা ইন্দ্র-নাথের কণ্ঠস্বরে উভয়েই সচকিত হইয়া উঠিল। সুচিত্রা বলিল, বাবা এলেন, না? তোমায় ডাকচেন বোধ করি।

ডাকুন। বলিয়া মতিলাল তেমনি ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, সেখান হইতে নড়িল না।

সুচিত্রা নিজেই বাহির হইয়া আসিল। এদিকে দাদার ডাক শুনিয়া চন্দ্রনাথ, নিখিল ও অসিতা নামিয়া আসিয়াছিল।

এই যে দাদা এলে? বলিয়া দুর্ব্বল চন্দ্রনাথ তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই, ইন্দ্রনাথ কেমন যেন বিকৃত কণ্ঠে কহিলেন, তোরা এসেচিস্? বেশ।

নিখিলকে তিনি চিনিতে পারিলেন না। সেও উঠানের অন্ধকারে একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল।

অসিতা বাবার কাছে না গিয়া দিদির কাছে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মুখ দিয়া তাহার একটি কথাও বাহির হয় নাই।

ইন্দ্রনাথ ও চন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া গেলেন। সুচিত্রা অসিতার হাত ধরিয়া তাঁহাদের পশ্চাতে সিঁড়ি দিয়া উঠিতে লাগিল।

দুই বোনে ইন্দ্রনাথকে গড় হইয়া প্রণাম করিতেই, তিনি হঠাৎ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। আয়, আয় মা, আয়। বলিয়া তাহাদের দুজনের দুই হাতে ধরিয়া কেমন যেন অভিভূতের মত বহু দিন পরে আজ তাঁহার দুই কন্যার মুখের পানে ঘন-ঘন তাকাইতে লাগিলেন।

চন্দ্রনাথ দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। সে যেন আজিকার এই দৃশ্য দেখিবার জন্যই এখনও বাঁচিয়া আছে,—এইবার সে মরিতে চায়!... তাহার চোখ দুইটা আনন্দে ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল।

ইন্দ্রনাথ অসিতার মুখের পানে তাকাইয়া বলিলেন, তুই যে বড় রোগা হয়ে গেছিস্ অসিতা?

সুচিত্রা বলিল, শ্বশুরবাড়ী থেকে এমনি হয়ে এসেছে।

অসিতা নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

ইন্দ্রনাথ কাপড় জামা না ছাড়িয়াই মতিলালকে ডাকিলেন। সঙ্গোপনে তাহাকে একটা নিভৃত কক্ষে লইয়া গিয়া অনুচ্চকণ্ঠে কহিলেন, হারামজাদা, পাজি! এ কি করেছিস তুই? আমায় কি এখান থেকে তাড়াবার মতলব করেছিস না কি হতভাগা?

মতিলাল কি যেন বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার কথা বলিবার পূর্ব্বেই দরজার নিকট হইতে সুচিত্রা বলিল, চা কোরব বাবা? না, সর্ব্বৎ খাবেন? কাপড় জামা ছেড়ে' ফেলুন।

হ্যাঁ যাই। একটুখানি চা কর্ মা। বলিয়া ইন্দ্রনাথ বাহির হইয়া আসিলেন। মতিলাল একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

পরদিন রবিবার। বৈকালের দিকে ইন্দ্রনাথ মতিলালকে ডাকিয়া বলিলেন, সবই তো হলো, এইবার ভাড়া দেবার জন্যে ইটলির বাড়ীতে একটা To let (টু-লেট্) টাঙিয়ে দিয়ে আয়, বুঝলি?

বেশ বাবু, যাই। বলিয়া মতিলাল নিচে নামিয়া আসিয়া একটা কাগজের বোর্ডের উপর 'টু লেট' কথাটা লিখিয়া দিবার জন্য নিখিলের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল; কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইল না। নিচে তাহাকে খুঁজিয়া না পাইয়া ভাবিল, সে উপরেই আছে। মতিলাল পুনরায় উপরে উঠিয়া গেল। সুমুখের ঘরে সুচিত্রা বসিয়া ছিল, জিজ্ঞাসা করিল, নিখিলবাবুকে দেখেছ মা?

কেন, তার ঘরে নেই?

কই, দেখতে তো পাচ্ছিনে। ইটলির বাড়ীর জন্য একটা 'টু লেট্' লিখে দিতে হবে যে! তুমিই দাও না মা, লিখে!

নিখিলের সেদিনের কথাটা হঠাৎ সুচিত্রার মনে পড়িল। যে কথাটা লইয়া সে অহোরাত্র নাড়াচাড়া করিতেছে, আজিকার এই ক্লান্ত মধ্যাহ্নেই কি তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিয়া গেল! সুচিত্রা আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়া তাড়াতাড়ি সেখান হইতে উঠিয়া সিঁড়ি ধরিয়া নিচে নামিতে নামিতে বলিল, এসো। মতিলালও তাহার পশ্চাতে নামিতে লাগিল।

সুচিত্রা প্রথমেই নিখিলের ঘরে ঢুকিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। দেখিল, তাহার জুতা, জামা, কোথাও কিছু নাই! এমন কি তাহার একমাত্র সম্বল চামড়ার সুটকেশটা পর্য্যন্ত অন্তর্হিত হইয়াছে। টেবিলের নিকট অগ্রসর হইয়া দেখিল, কাগজপত্র যেমন থাকে, তেমনি বিশৃঙ্খল ভাবে ছড়ানো রহিয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যে প্রয়োজনীয় কোনটাই নহে।...এই শূন্য গৃহের মতই সুচিত্রার অন্তঃকরণের মধ্যে একটা বিরাট শূন্যতা খাঁ-খাঁ করিতে লাগিল। সে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া উদাস দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল।

মতিলাল জিজ্ঞাসা করিল, কি হলো মা?

সে যে কি কাজের জন্য আসিয়াছে, এতক্ষণে তাহার মনে পড়িল। টেবিলের উপর হইতে কলমে কালি লইয়া বলিল, কিসে লিখ্‌ব ছাই, তোমার বোর্ড কোথায়?

ওই একটা কাগজের উপর লিখে দাও না মা, বোর্ডে আমি আঁটিয়ে নেব।

একখানা সাদা কাগজের উপর সুচিত্রা বেশ বড়-বড় অক্ষরে লিখিল To let. Please enquire at—এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই বলিল, এ বাড়ীর নম্বর কত মতিলাল?

মতিলাল বলিল, তিন শ পঁচিশ,—কে।

325-K, Park street লিখিয়া, কাগজখানা সুচিত্রা মতিলালের পায়ের নিকট ফেলিয়া দিয়া বলিল, যাও।

কাগজটা কুড়াইয়া লইয়া মতিলাল চলিয়া গেল।

সুচিত্রা সেখান হইতে নড়িতে পারিল না। তাহার বক্ষে তখন সুতীব্র বেদনার সঙ্গে-সঙ্গে দুর্দ্দমনীয় অশ্রুর উচ্ছ্বাস দুরন্ত আবেগে কণ্ঠ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া আসিয়াছিল। প্রাণপণ চেষ্টাতেও সুচিত্রা সে অশ্রুর উৎস নিরোধ করিতে পারিল না। সহসা টেবিলের উপর মাথা গুজিয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

তেমনি নীরবে কতক্ষণ ধরিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছে কে জানে! ঝড়ের একটা দম্‌কা বাতাস সশব্দে জানালার কবাটের উপর আসিয়া লাগিতেই, মাথা তুলিয়া সে বাহিরের পানে তাকাইয়া দেখিল, বৈশাখী খর-রৌদ্রের তীব্রোজ্জ্বল দীপ্তি তখন নিঃশেষে নিভিয়া গিয়াছে, এবং তাহার পরিবর্ত্তে পশ্চিমের আকাশটা অন্ধকার করিয়া কাল-বৈশাখীর কালো মেঘ ঘনাইয়া উঠিয়াছে। মেঘ-গর্জ্জনের সঙ্গে-সঙ্গে উন্মত্ত ঝঞ্ঝা

ঝড়ো হাওয়া

চারিদিকে হাহাকার করিয়া ফিরিতেছে!...আঁধার আকাশের ঘন-কৃষ্ণ মেঘাস্তরণ ভেদ করিয়া একটা বক্র বিদ্যুৎ সহসা তাহার চোখের সুমুখে উঁকি মারিল! · বিদ্যুতের সেই খরতর ক্রূর হাসি, সুচিত্রার বেদনা-ক্ষুব্ধ অন্তঃকরণের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যেন একটা তীক্ষ্ণধার ছুরি হানিয়া নির্ম্মম ভাবে বিদীর্ণ করিয়া দিল।—মা গো! বলিয়া একটা অজানা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া, সুচিত্রা তাহার দুই দৃঢ় মুষ্টিতে টেবিলের দুইটা কোণ চাপিয়া ধরিল!...এমন অসময়ে সে কোথায় গেল?...কেন গেল?...কোন্ নিরাশ্রয় পথের মাঝে সে বোধ করি এখনও পথ চলিতেছে! ঝড়, ঝঞ্ঝা, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ—সবই কি তাহার মাথার উপর দিয়া চলিয়া যাইবে!...তাহাকে যে কেহ দেখিবার নাই! বলিবার নাই!...সুচিত্রা এইবার তাহার জল-ছল-ছল চক্ষু দুইটি ঊর্দ্ধে,—সে কোন্ দূর, দূরান্তের পানে নিবদ্ধ করিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিল,—সে উচ্ছৃঙ্খল উদ্দাম পথিককে আজ এই প্রলয়ের দিনে তুমিই রক্ষা করিও!...আমার আর কিছুই বলিবার নাই।..

সুচিত্রা আর সেখানে বসিয়া থাকিতে পারিল না। ধীরে ধীরে চোখ দুইটি ভাল করিয়া মুছিয়া লইয়া উপরে উঠিয়া গেল। এ সময় মানুষের সংস্রব তাহার ভাল লাগিতেছিল না। অসিতা নির্জ্জন গৃহের মধ্যে একাকী বসিয়া রহিয়াছে দেখিয়াও সুচিত্রা সেখানে প্রবেশ করিল না। পার্শ্বে একটা নির্জ্জন কক্ষে আবার জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। সমস্ত শহরের উপর দিয়া ঘূর্ণী হাওয়া নাচিতেছে,—বাহিরে

৩

সেদিন অফিসের ছুটির পর চন্দ্রনাথ বলিল, আজ কি তুমি যেতে পারবে নিখিল? সুচিত্রা আজ তোমায় ধরে' নিয়ে যেতে বলেছে।

নিখিল ঈষৎ হাসিল। বলিল, ধরে' নিয়ে যেতে হবে না কাকাবাবু, চলুন, আমি একটুখানি পরে যাচ্ছি।

কিন্তু এই খামখেয়ালী যুবকটিকে চন্দ্রনাথ চিনিত, বলিল, কিন্তু পরশুও তো যাব বলে গেলে না? আজ সত্যিই যাবে ত? তা নইলে আজ তোমায় আমি ছাড়ব না।

নিখিল বলিল, যাবেন আমার সঙ্গে? আমি অরুণের কাছে যাচ্ছি।

অরুণের নামটা শুনিয়া প্রৌঢ় চন্দ্রনাথ যেন আনন্দে লাফাইয়া উঠিল, বলিল, অরুণ? অরুণ? সেই অরুণ, যার বাবাকে চিঠি লিখলুম? —আমায় বল্‌তে হয়, আমায় বল্‌তে হয় নিখিল, চল, দেখেই আসি।

আনন্দের উচ্ছ্বাস তাহার এত বেশী হইয়া পড়িয়াছিল যে, পথে চলিতে চলিতেও সে তাহা সাম্‌লাইতে পারিল না, বলিল, আমি যে তোমায় কি বলে' আশীর্ব্বাদ কোরব নিখিল, কিছু বুঝতে পারচি না—

চন্দ্রনাথ আরও কি বলিতে যাইতেছিল, নিখিল বাধা দিয়া বলিল, আমার ওগুলো ভাল লাগে না কাকাবাবু, আপনি চুপ করুন।

আচ্ছা বেশ। বলিয়া সে মৌন হইয়া পথ চলিতে লাগিল বটে, কিন্তু

ঝঞ্ঝার গর্জ্জন তখনও থামে নাই,—আকুল উদ্দেশে পাগল বায়ু তখনও কাঁদিয়া ফিরিতেছিল।...আবার তাহার নিখিলকে মনে পড়িল। বিদায়-বেলায় সে আরও কিছু বলিয়া গেল না কেন?—হিমাদ্রির মত তাহার বাক্যহীন অটল মৌনতা তাহার কাছে কোন দিন একটি নিমেষের জন্যও ভাঙিল না কেন? · বাহিরের সর্ব্বনাশা বিধি-নিষেধের মহৎ মর্য্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া, সবিনয়ে এবং সগৌরবে মহত্তম দুঃখের বোঝা মাথায় লইয়া তুমি তো চলিয়া গেলে; কিন্তু যাইবার সময় তোমার সেই স্বপ্নময় নিবিড়-কালো চোখের তারাদুটি একটী মুহূর্ত্তের জন্যও কি আমাকে দেখা দিবার এবং দেখিবার আশায় চঞ্চল হইয়া উঠে নাই!···এই পিঞ্জরাবদ্ধ বন্দিনীর পঞ্জরের তলায় যে অরুন্তুদ ব্যথা আজ হইতে অসহ্য বেদনায় গুঞ্জরিয়া উঠিবে, তাহার জন্য কি সান্ত্বনা তুমি রাখিয়া গিয়াছ নিষ্ঠুর!···

সুচিত্রা মেঝের উপর বসিয়া বসিয়া আবার কাঁদিতে লাগিল।

এদিকে এই দুরন্ত ঝড়ের বেগ সামলাইয়া কোনরকমে হাঁপাইতে হাঁপাইতে মতিলাল ইটিলি হইতে ফিরিয়া আসিল। কাকাবাবু নিচের ঘরে বসিয়াছিল,—মতিলাল তাহার জামার পকেট হইতে একখানা পোষ্টকার্ডের চিঠি বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল, নিন্ ছোটবাবু, ওবাড়ীর চিঠির বাক্সে এই একখানা মাত্র চিঠি পড়েছিল।

কার্ডখানা চন্দ্রনাথ পড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মেঘে-মেঘে এমনি অন্ধকার হইয়াছিল যে, তাহার একটি অক্ষরও সে পড়িতে পারিল না। মতিলাল আলোর সুইচটা টিপিয়া দিল।

চন্দ্রনাথ পড়িল,—অরুণের বাবা উমেশবাবু লিখিয়াছেন,—

সম্মান পুরঃসর নিবেদন মেতৎ—

—এই পত্রদ্বারা জানাইতেছি যে, বধূমাতাকে আর এ বাটীতে কোন দিন পাঠাইবেন না। পাঠাইলেও এখানে তাহার স্থান হইবে না। অরুণের পুনরায় বিবাহ দিয়া নূতন একটি বধূমাতা আমি ঘরে আনিয়াছি। জ্ঞাতার্থে নিবেদনমিতি।

চিঠিখানা একনিশ্বাসে পড়িয়া ফেলিয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে চন্দ্রনাথ সেখান হইতে উঠিল।

মতিলাল বলিল, অমন কোরচেন যে বাবু? চিঠিতে কি কোনও খারাপ খবর আছে?

কিন্তু তাহার কথার কোন উত্তর না দিয়াই টলিতে টলিতে চন্দ্রনাথ পাগলের মত উপরে উঠিবার সিঁড়ির নিকট গিয়া দাঁড়াইল। একবার ডাকিল, নিখিল।

কোন সাড়া না পাইয়া সে দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া গেল। কিন্তু কোথায় কাহার নিকট যে এ নিদারুণ দুঃসংবাদ বহন করিয়া লইয়া যাইবে, কিছুই ঠিক পাইল না। তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে প্রবেশ করিতেই দেখিল, মেঝের উপর কে যেন পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিতেছে। কম্পিতকণ্ঠে চন্দ্রনাথ কহিল, কে রে? সুচিত্রা?

সুচিত্রা তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিতেই, চন্দ্রনাথ নিজেই আলোটা জ্বালিয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, তুই এ-চিঠি পড়েচিস্? কাঁদচিস

যে? বলিয়া কম্পিত হস্তের মুঠার মধ্যে ধরিয়া চিঠিখানা তাহাকে দেখাইল।

সুচিত্রা কিছুই বুঝিতে পারিল না। বলিল, কি? কার চিঠি?

চিঠিখানা তাহার গায়ের উপর ফেলিয়া দিয়া চন্দ্রনাথ বলিল, ত্যাখ্‌ ত' মা পড়ে? জোরে জোরে পড়্‌ ত' শুনি? ভুল পড়লুম না তো?

হঠাৎ চোখের সুমুখে বজ্রপাত হইলে মানুষ যেমন আতঙ্কে চকিত হইয়া উঠে, চিঠিখানা পড়িয়া সুচিত্রা তেম্‌নি, ও মা গো! বলিয়া শিহরিয়া উঠিল। দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া পড়িল। মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না; কিন্তু চোখ দিয়া তপ্ত অশ্রুর ধারা আবার গড়াইয়া পড়িল।

উন্মাদের মত চন্দ্রনাথ চিঠিখানা কুড়াইয়া লইয়া 'দাদা' বলিয়া কি যেন বলিতে গেল, কিন্তু ঠোঁট দুইটা কাঁপিতে কাঁপিতে গলার স্বরটা কোথায় যেন আটকাইয়া রহিল। কিছু না বলিয়াই বোধ করি সে সে তাহার দাদার ঘরের দিকে অগ্রসর হইল।

অসিতা সে সময় জানালার ধারে নিস্তব্ধ বিরলে বসিয়া একাগ্রমনে ঝড় দেখিতেছিল।...

শেষ

তাহার সে মৌনতা ভেদ করিয়া অন্তরের মধ্যে যে কলরোল উঠিয়াছিল, তাহা একমাত্র তাহার অন্তর্যামী ব্যতীত আর কেহ জানিল না।

মেডিকেল কলেজে অরুণ ডাক্তারি পড়ে। তাহার হোষ্টেলের কাছাকাছি আসিয়া চন্দ্রনাথ কহিল, বিয়ে না করে' ভেবেছিলুম, বেশ নির্লিপ্ত ভাবে শেষের দিনগুলো কেটে যাবে; কিন্তু দাদা যে এমন কোরবে, তা কে জান্‌তো বাবা।—মেয়ে দুটোকে নিয়ে আবার জড়িয়ে পড়লুম। আর, সে অভাগীদেরও কপাল, অমন রাজার মত বাপ ছেড়ে শেষকালে কি না আমার ঘাড়ে এসে পড়্‌লো। কিন্তু এ কথাও ঠিক নিখিল, তোমায় না পেলে--

বাধা দিয়া নিখিল বলিল, আবার!

আচ্ছা বেশ বেশ। আর বল্‌বো না। কিন্তু—বলিয়া চন্দ্রনাথ চুপ করিল।

নিখিল বলিল, আপনাকে এখন থেকে সাবধান করে' দিচ্ছি কাকাবাবু, অরুণের কাছে যেন ফড়্‌ ফড়্‌ করে' কোন কথা বলে' ফেল্‌বেন না।

না, না, ছি! তাই কি বলে? তুমি যখন বারণ কর্‌চো —। আচ্ছা নিখিল, আমি বড় উদ্বক্তা, নয়? দাদা আমায় এই জন্যে অনেকবার বকেছে; বল্‌তো, চন্দ্রনাথ, তুই কখ্‌খনো কিছু কোরতে পারবি না, তুই বড় বোকা। কিন্তু স্কুল-কলেজে আমি কখনও ফেল্‌ করিনি, বেশ ভাল ছেলে ছিলুম।

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

চৈত্র—১৩৩০

মূল্য দুই টাকা

নিখিল কোন কথা বলিল না।

কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া অরুণ তাহার দোতলা-হোষ্টেলের উপরের একটা ঘরে বসিয়া কয়েকজন বন্ধুর সহিত কি-একটা বিষয় লইয়া তুমুল তর্ক করিতেছিল, হঠাৎ নিখিল সেখানে প্রবেশ করিতেই তাহাদের চীৎকার বন্ধ হইয়া গেল। অরুণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বারে ছোক্‌রা, এ যে দেখ্‌চি, বেশ good boy (গুড্ বয়)—এই এই পর্য্যন্ত বলিয়া সহসা তাহার পশ্চাতে এক অপরিচিত ভদ্রলোকের দিকে নজর পড়িতেই সে তাহার কথাটা শেষ করিতে পারিল না।

আমার ঘরে আয়। বলিয়া অরুণ তাহাদিগকে তাহার নিজের ঘরে লইয়া গিয়া বসাইল। বোস্, আমি আস্‌ছি বলিয়া অরুণ বাহিরে গিয়া হোষ্টেলের চাকরটাকে বোধ করি চা, পান ইত্যাদি আনিবার আদেশ দিয়া নিজেও ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের কাছে বসিল। চন্দ্রনাথের পরিচয় দিয়া নিখিল বলিল, উনি একবার তোকে দেখ্‌তে চাইলেন, তাই সঙ্গে নিয়ে এলুম।

অরুণ নিতান্ত অপ্রতিভের মত হেঁট হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। সন্ধ্যা প্রায় ঘনাইয়া আসিয়াছিল। ইলেকট্রিকের সুইচ্‌টা টিপিয়া দিয়া অরুণ একবার নিখিলের মুখের পানে তাকাইয়া ইসারায় কি-একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু নিখিল অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া ছিল বলিয়া কথাটা তাহার আর বলা হইল না।

চন্দ্রনাথ অরুণকে বার-কতক দেখিয়া লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া

ছিল। কাহারও বর দেখিতে সে জীবনে কোন দিন আসে নাই। তাহার নিজের বিবাহের সময় তাহাকে দেখিতে আসিয়া কন্যাপক্ষীয় অভিভাবক যে কি-কি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, সে কথাও আজ তাহার স্মরণ নাই; সুতরাং কি বলিয়া যে তাহাদের নীরবতা ভঙ্গ করিবে, তাহা সে বুঝিতেই পারিল না; অধিকন্তু এমন ভাবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকাও তাহার কাছে নিতান্ত বিরক্তিকর এবং অশোভন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। চন্দ্রনাথের মনে যে কোন প্রশ্নের উদয় হইতেছিল না এমন নয়, তবে সে-সব কথা বলিতে গিয়া এখনই হয়ত সে তাহাদের ঘরের কথা, দুঃখ-দৈন্যের কথা এবং তাহার দাদার কথা বলিয়া ফেলিবে ভাবিয়া, মৌন হইয়া সে নিখিলের নিষেধ-আজ্ঞা অক্ষরে-অক্ষরে পালন করিতেছিল। অরুণের জাতি, গোত্র জানিবার মত একটা কথা ছিল, কিন্তু নিখিল তাহা জানাইয়াছে এবং তাহাদের সহিত যোটনেও ঠিক মিলিয়াছে, শুধু দেখিতে বাকী ছিল, তাহাও তো হইল।

কিন্তু চন্দ্রনাথের এ ধৈর্য্য অধিকক্ষণ টিঁকিল না। অরুণকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল, বসো বাবা অরুণ, তুমি বসো—দাঁড়িয়ে রইলে যে?

অরুণ বসিল। চন্দ্রনাথ কহিল, এ বৎসর তোমার কোন্ year (ইয়ার)?

অরুণ নতমুখে কহিল, Third year (থার্ড ইয়ার্)।

বেশ বাবা, বেশ হবে। আমিও তোমাকেই যেন এতদিন

খুঁজছিলুম। নিজের মেয়ের গুণ কীর্ত্তন করা ভালো শোনায় না, কিন্তু তবুও বলি, তাকে বৌ করবার সাধ তোমার বাবারও হবে। তবে, বেশী-কিছু তো দিতে পারবো না বাবা। দাদা আমার বাড়ীতে থাকলেও বা—। হায়, হায়, তাহ'লে আর ভাবনা কি ছিল বাবা, রাজার জামাই—

কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ নিখিলের চোখ দুইটার দিকে তাহার নজর পড়িতেই দেখিল, সে তাহার দিকে কট্‌মট্ করিয়া তাকাইয়া আছে। চন্দ্রনাথ নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া থতমত খাইয়া চুপ করিয়া গেল। তাইত, কথায় কথায় যে সেই কথাটাই আসিয়া পড়িয়াছে!

নিখিল বলিল, চিঠি তোর বাবাকে উনিই লিখেচেন, বোধ করি রবিবারের আগেই এসে পড়বেন।

চন্দ্রনাথ বলিল, আমারই সেখানে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু নিখিল বল্‌লে, তিনি এলেই ভালো হবে,—কথাবার্ত্তাও স্থির হবে, মেয়েও দেখে যাবেন। আর আমারও হয়েছে সব দিকে মুস্কিল বাবা, একে তো চাকরী আছে, না গেলে উপায় নেই, তার পর মেয়ে দুটোকে একলা ফেলে—

এই রে! আবার কিছু বলিয়া ফেলে বা! তাহার ভয় হইল; কাজেই কথাটার স্রোত অন্য দিকে ফিরাইয়া দিয়া কাকাবাবুকে থামাইয়া দিবার জন্য নিখিল বলিয়া উঠিল, চিঠিটার ঠিকানায় মুরারীপুর পোষ্ট অফিস লিখেচেন ত? আমার ঠিক মনে হচ্ছে না।

এবারেও আর একটুখানি অপ্রতিভ হইয়া গিয়া সে বলিল, হ্যাঁ, বোধ করি মুরারীপুরই লিখেচি। তাহার পর হঠাৎ কি ভাবিয়া চন্দ্রনাথ উঠিয়া দাঁড়াইল, নিখিলকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, তোমরা কথাবার্ত্তা একটুখানি কও, আমি চল্লুম। তুমি আজ একবার যেয়ো যেন। বলিয়া সে বাহির হইয়া যাইতেছিল, এমন সময় চা, জলখাবার ইত্যাদি হাতে লইয়া চাকরটা ঘরে প্রবেশ করিল। অরুণ বলিল, চা এসেচে, আপনি একটু বসেই যান।

চন্দ্রনাথ বলিল, না বাবা, আমি তো স্নানাহ্নিক না করে' কিছু খাব না। তোমরা দুজনে খাও, আমি আসি। বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল কিন্তু প্রাণের দুরন্ত আবেগ রোধ করিতে না পারিয়া পরক্ষণেই আবার ফিরিয়া আসিয়া দরজার নিকট হইতে ডাকিল, অরুণ!

নিখিল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অরুণ তাড়াতাড়ি তাহার নিকট অগ্রসর হইয়া যাইতেই, চন্দ্রনাথ তাহার একখানা হাত নিজের দুই হাতের মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিল, এ গরীবকে যদি বাঁচাও বাবা।—তাহার আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু ঠোঁট দুইটা এম্‌নিভাবে কাঁপিয়া উঠিল যে, আর-কিছু মুখ দিয়া বাহির হইল না।

বাবা আসুন। আপনার এত ভাবনা কিসের? বলিয়া অরুণ নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

এই বেদনার সূত্র ধরিয়া চন্দ্রনাথের চোখের কোণে এক ঝলক্

অশ্রু টল্ টল্ করিয়া উঠিল। অরুণের হাতখানা ছাড়িয়া দিয়া আর কোন কথা না বলিয়া সে সিঁড়ি ধরিয়া নিচে নামিয়া গেল। চোখ ছুইটা অতি সঙ্গোপনে কোঁচার খুঁটে মুছিয়া লইয়া হোষ্টেলের ফটক্ পার হইয়া সে রাস্তার উপর নামিল। অরুণের শেষ কথাটি তখনও তাহার কাণে স্পষ্ট বাজিতেছিল। পথ চলিতে চলিতে সে মনে-মনেই বলিল, আমার ভাবনা যে কিসের, তা তোমরা কেমন করে জানবে বাবা!

৪

উনানের উপর তরকারি চড়াইয়া দিয়া দরজার দিকে পাশ ফিরিয়া সুচিত্রা বসিয়া ছিল। দেওয়ালের গায়ে কেরোসিনের যে ডিবেটা জ্বলিতেছিল, তাহাতে আলোকের পরিবর্ত্তে ঘরের অন্ধকারটাই যেন ভাল করিয়া জমিয়া উঠিয়াছে। আগুনের আভায় সুচিত্রার মুখ হইতে আরম্ভ করিয়া দেহের অর্দ্ধেকখানা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অসংবদ্ধ চুলের দু'একটা গুচ্ছ তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে!

নিখিল তাহারই নিকট আসিতেছিল, কিন্তু সুচিত্রার চিন্তাভারাবনত এই শান্তোজ্জ্বল মুখের পানে তাকাইয়া হঠাৎ রান্নাঘরের দরজার নিকট সে দাঁড়াইয়া পড়িল, সহসা কোন প্রশ্ন করিয়া তাহার ধ্যান ভঙ্গ করিতে নিখিলের ইচ্ছা হইল না। সেদিক হইতে তাহার চোখ দুইটাও যেন সে ফিরাইয়া লইতে পারিতেছিল না। গত একটি বৎসর ধরিয়া প্রায় প্রত্যহই সে সুচিত্রাকে দেখিয়া আসিতেছে, কিন্তু আজিকার মত তাহার এ অপূর্ব্ব রূপ কোন দিন তাহার চোখে পড়ে নাই,—এ যেন সে সুচিত্রা নয়, এ যেন একটি বিধবা বালার ব্যর্থ জীবন-যৌবন, তাহার

সকল জ্বালা, সকল অভিশাপ লইয়া আজ এই নিভৃত-নিরালায় হোমানল শিখার মতই জ্বলিয়া উঠিয়াছে!

অমন করে দাঁড়িয়ে কি দেখ্‌চো নিখিল-দা? কখন এলে? বলিয়া হাসিতে হাসিতে অসিতা সেই ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

ইহার উত্তরের জন্য নিখিল মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সহসা সে যেন অপ্রস্তুত হইয়া গেল।

সচকিত হইয়া সুচিত্রা দরজার পানে মুখ ফিরাইল। দেখিল, নিখিল দাঁড়াইয়া আছে।

চোখ দুইটা তাহার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; কহিল, অনেকক্ষণ এসেচ না কি?

দৃঢ়কণ্ঠে নিখিল বলিল, হ্যাঁ।

ময়দার থালাটা সরাইয়া লইয়া অসিতা জল দিতে যাইতেছিল, সুচিত্রা বলিল, পিঁড়িটা সরিয়ে দেত' অসিতা! তাহার পর নিখিলের দিকে মুখ তুলিয়া বলিল, বসো।

নিখিল পিঁড়ির উপর চাপিয়া বসিলে সুচিত্রা বলিল, দুদিন এলে না, ভাব্‌লুম, বুঝি বা অসুখ-বিসুখ হলো,—তাই কাকাবাবুকে বলেছিলুম। তোমার সে 'এতিম্‌-খানা'য় অসুখ হলেই তো সর্ব্বনাশ।

'এতিম্‌-খানা' কি রকম? আমাদের 'মেস্‌টা কি 'অরফেনেজ্‌' (orphanage) না কি? অর্‌ফেন্‌ আমি হতে পারি, তাই বলে মেস্‌টা আমাদের অর্‌ফেনেজ্‌ নয়।

সুচিত্রা বলিল, তা বেশ, অরফেনেজ না হয় প্যালেস্ই (palace) ধরে নিলুম, কিন্তু এদিকে তোমার মক্কেলটির কথা শুনেছ? কাকাবাবুর কাছে শুনে অবধি আমার সঙ্গে ঝগ্ড়া কর্‌চে।

কথাটার ঠিক অর্থ গ্রহণ করিতে না পারিয়া নিখিল কহিল, আমার মক্কেল আবার কে?

ওই যে দাঁড়িয়ে। যার জন্যে তুমি খেটে মর্‌ছো, বলিয়া সুচিত্রা অঙ্গুলি নির্দ্দেশের পরিবর্ত্তে তাহার হস্তধৃত তরকারি নাড়িবার খুন্তি নির্দ্দেশ করিয়া অদূরে অসিতাকে দেখাইয়া দিল।

কেন, ও কি বলে?

মুখ টিপিয়া ঈষৎ হাসিয়া সুচিত্রা বলিল, বিয়ে কোর্‌বে না।

চিরকুমারী থাক্‌তে চাস্ না কি অসিতা? বলিয়া নিখিল একবার তাহার মুখের পানে তাকাইল।

জল দিয়া ময়দাগুলা মাখিতে মাখিতে অসিতা দৃঢ় অথচ সহজ কণ্ঠে কহিল, হ্যাঁ, তাই।

তরকারিটা উনান হইতে নামাইয়া দিয়া সুচিত্রা ভাঁড়ারের দিকে চলিয়া গেল।

একটুখানি রহস্যের ছলে নিখিল অসিতাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, তবে আমায় ঘুরিয়ে মারবার কি দরকার ছিল তোর? আমি যে সব ঠিক করে এলুম!

বাঃ, আমি কি বলেছিলুম না কি?

তুই না বলিস্, উনি তো বলেছিলেন! বলিয়া নিখিল সুচিত্রার পরিত্যক্ত আসনের দিকে মুখ ফিরাইয়া ইঙ্গিতে কথাটা তাহাকে বুঝাইয়া দিল।

তা উনি বলুন, কিন্তু আমি বল্‌ছি, তোমরা বৃথা চেষ্টা করো না। আমি বেশ আছি।

তাহাকে একটুখানি রাগাইয়া দিবার জন্য নিখিল বলিল, মিছে কথা বলিস্ না অসিতা, বিয়ে কোরতে চায় না এমন মেয়ে আমি দেখিনি।

এইবার অসিতা জোরে-জোরে বলিয়া উঠিল, তুমি মিছে কথা বলো না বল্‌চি নিখিল-দা, তোমার পায়ে আমি মাথা খুঁড়ে দেব।

দে না মাথা খুঁড়ে, তোরই মাথা ফুটবে, আমার কি?

তবে এই নাও। বলিয়া অসিতা সত্যসত্যই উঠিয়া আসিতেছিল, নিখিলও উঠিতে উদ্যত হইয়া বলিল, আমি অত-সব জানিনে বাপু, এই আমি চল্লুম কাকাবাবুর কাছে,—যা কোরতে হয়, তিনিই করুন।

কাকাবাবু চীৎকার করিয়া তিরস্কার করিয়া তাহা হইলে এখনি একটা হৈ চৈ কাণ্ড বাধাইয়া দিবেন, সে কথা অসিতা জানিত, তাই সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া কাঁদ-কাঁদ সুরে বলিয়া উঠিল, তোমরা সবাই মিলে আমায় তাড়াতে চেয়েছ নিখিল-দা,—যত নষ্টের মূল শুধু তুমি।

নিখিল বলিল, আচ্ছা বেশ। কাল থেকে এ আপদ বিদায় হবে, আর আস্‌ব না কখ্‌খনো।

সুচিত্রা কি কাজের জন্য উপরে উঠিয়া গিয়াছিল, বারান্দা হইতে হাঁকিল, ময়দাগুলো শীগ্‌গির মেখে নে অসিতা, সাড়ে আটটা বাজ্‌লো।

পুনরায় ময়দার থালাটা কোলের নিকট সরাইয়া লইয়া অসিতা মুখভারি করিয়া বলিল, তুমি এসো না, তাই আমি বল্‌লুম?

গম্ভীর ভাবে নিখিল উত্তর দিল, তা না ত' কি?

বেশ। যাও,—তোমাদের সঙ্গে আর কথা বল্‌তে চাই না।

ভাল। বলিয়া নিখিল চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু বেশীক্ষণ মৌন হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। হঠাৎ বলিয়া উঠিল, তুই এক কাজ কোরতে পারিস্ যদি অসিতা, তাহলে ত্থাখ্ তোর বিয়েটা বন্ধ করে দি।

অসিতা হেঁটমুখে গম্ভীরভাবে নিজের কাজ করিতে লাগিল, কোন কথা বলিল না।

নিখিল বলিল, শুধু পায়ের উপর মাথা খুঁড়্‌লে চল্‌বে না, আমাদের সবার সুমুখে হাত দুই-তিন নাকখৎ দিতে হবে।

অসিতা এইবার ময়দার থালা, চাকা, বেলুন ইত্যাদি তুলিয়া লইয়া নিখিলের দিকে পিছন ফিরিয়া বসিল।

নিখিল আর থাকিতে না পারিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। এমন সময় সুচিত্রা ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার একহাতে একপেয়ালা গরম চা এবং অন্যহাতে একটা ডিসের উপর খানকতক মাখন-মাখানো রুটি দেখিয়া নিখিল বলিল, তুমি বুঝি এই জন্যে উঠে গেলে?
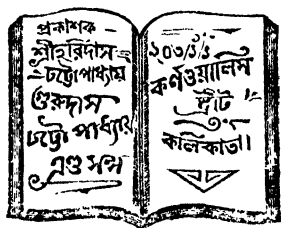
প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঁঙ

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্ক

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিক

হ্যাঁ। বলিয়া সেগুলা তাহার সুমুখে ধরিয়া দিয়া সুচিত্রা জিজ্ঞাসা করিল, হাস্‌ছিলে যে তোমরা ?

তোমরা নয়, আমি একা।—ওই ছাখ। বলিয়া নিখিল অসিতাকে দেখাইয়া দিল।

এতক্ষণ ধরে' ক্ষেপাচ্ছিলে বুঝি ?

হ্যাঁ।

ছি ! তোমার ভারি অন্যায়। বলিয়া সুচিত্রা মুখ টিপিয়া হাসিল।

কাল থেকে এখানে ও আমায় আস্‌তে নিষেধ ক'রে দিয়েছে।

বেশ তো। এসো না। বলিয়া সুচিত্রা একবার তাহার মুখের পানে তাকাইল।

অসিতা এইবার কথা কহিল, খবরদার বলছি নিখিলদা, মিছে কথা বলো না, তাহলে ভাল হবে না বলে' দিচ্ছি। বলিয়াই সে আবার মুখ ফিরাইয়া কাজ করিতে লাগিল।

নিখিল ও সুচিত্রা একটুখানি হাসিল মাত্র।

সুচিত্রা জিজ্ঞাসা করিল, অরুণ কি তোমার বন্ধু ?

হ্যাঁ, ছেলেবেলায় একসঙ্গে পড়েছিলুম বটে।

দেখ্‌তে শুন্‌তে কেমন ?

দেখ্‌তেও ভালো, শুন্‌তেও ভালো।

অসিতা বিপরীত দিকে মুখ রাখিয়াই বলিয়া উঠিল, তোমরা যা-খুশী তাই কর দিদি, আমি আর কিচ্ছু বোল্‌ব না।

সুচিত্রা বলিল, তা বেশ। তোকে কিছু বোল্‌তে হবে না। যা খুশী তাই, আমরা তুই বল্‌লেও কোর্‌ব, না বল্‌লেও কোর্‌ব। বলিতে বলিতে চোখ দুইটা হঠাৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নিখিলের মুখের পানে তাকাইতেই দেখিল, অর্দ্ধ সমাপ্ত চায়ের পেয়ালার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সে যেন কি ভাবিতেছে।

সুচিত্রা আবার প্রশ্ন করিল, তাদের অবস্থা বোধ করি বেশ ভাল।

গলাটা একবার পরিষ্কার করিয়া লইয়া নিখিল বলিল, হ্যাঁ।

বাবা ফিরে না এলে বিয়ে তো হবে না। কাকাবাবু কিছু বল্‌ছিলেন?

ফেরেন্‌ ভালোই, না ফির্‌লে আর কি কোর্‌বে, বল?

সম্পূর্ণ বিপরীত মুখে বসিয়া থাকিলেও, চাকা-বেলুনের খট্‌খট্‌ শব্দে এবং চুড়ির আওয়াজে অনুমানে বুঝিতে পারা যাইতেছিল যে, অসিতা আপন মনে পরোটা বেলিতেছে; কিন্তু এই সমস্ত শ্রুতিমধুর আলোচনার মাঝখানে হঠাৎ কোন সময় যে তাহার কর্ম্মরত হাত দুইটা থামিয়া গিয়াছে এবং অসিতাও যে এই সব কথাগুলা মন দিয়া শুনিতে আরম্ভ করিয়াছে, সুচিত্রা তাহা টের না পাইলেও নিখিল অনেকক্ষণ হইতে বুঝিয়াছিল। এইবার ঈষৎ হাসিয়া হাতের ইসারায় ব্যাপারটা সুচিত্রাকেও বুঝাইয়া দিল।

সুচিত্রা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে কহিল, তা'হলে অরুণের সঙ্গে আমাদের অসিতাকে মানাবে ভালো। যার তার হাতে কিন্তু আমি অসিতাকে দিতে পার্‌ব না।

নিখিল হাসিয়া বলিল, মানাবে না মানাবে, তা আমি কেমন করে' জান্‌ব ? রবিবার দিন তাকে এখানে আন্‌ব বলেচি,—তুমিও দেখো. অসিতাও ভালো করে' দেখে নেবে।

অসিতা এইবার হাতের বেল্‌নাটা ঘরের মেঝের উপর 'ঠাই' করিয়া ফেলিয়া দিয়া হন্ হন্ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সুচিত্রা ডাকিয়া বলিল, চলে গেলি যে অসিতা ? এ গুলো শেষ করে' দিয়ে যা।

আমি পারবো না, তোমরা কর। দুম্ দুম্ করিয়া সে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল।

নিখিল হাসিয়া উঠিল। অর্দ্ধ-সমাপ্ত রুটি, ময়দা এবং অন্যান্য সরঞ্জাম সুচিত্রা তাহার নিজের কাছে লইয়া আসিয়া পরোটাগুলা বেলিতে বসিল।

এতক্ষণে তাহাদের মনে হইল যেন নিজের কথা বলিবার অবসর মিলিয়াছে, কিন্তু উভয়কে উভয়ের এত নিকটে পাইয়াও কোন কথাই বলা হইল না। প্রথম বলিতে গিয়া নিখিল যে তথ্য অবগত হইল, তাহা একদিকে যেমন সত্য অন্যদিকে তেমনি নিষ্ঠুর,—তেম্‌নি কঠোর ! তাহাদের এই এককত্বের মধ্যে একান্ত ঘনিষ্টতার ঠিক মধ্যখানে, দুর্নিরীক্ষ্য অন্তরাল পর্য্যন্ত যে দূরত্বের ব্যবধান পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা অতিক্রম করিতে হইলে অনেক শক্তি অপচয় করিয়া অনেক বেগ পাইতে হয়, পথের মাঝে অনেক কিছু ভাঙিয়া চুরিয়া পা দিয়া মাড়াইয়া যাইতে হয়...

নিখিল ঈষৎ ম্লান হাসি হাসিয়া সুচিত্রার সাপের মত উজ্জ্বল এবং হরিণীর মত স্নিগ্ধ গভীর চোখ দুইটির পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমি রুটি বেলে' দেব ?

হাসিতে হাসিতে সুচিত্রা বলিল, পার্‌বে ? তুমি জান ?

না জান্‌লে কি আর পার্‌তে নেই ?

কই আর পার ?

নিখিল আর একবার তাহার মুখের পানে তাকাইয়া কহিল, চেষ্টা করে' দেখ্‌বার কি দোষ ? দেখিই না !

দেখ্‌তে পার। বলিয়া সুচিত্রা সরঞ্জামগুলা তাহার নিকট একে-একে সরাইয়া দিল।

কিন্তু সে যতবার চেষ্টা করিল, ততবারই কেহ দ্বিভুজ, কেহ চতুর্ভুজ, কেহ ত্রিকোণ, কেহ বহুকোণ আকার ধারণ করিতে লাগিল, —কেহ আর গোলাকার হইল না।

সুচিত্রা মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতেছিল !

অবশেষে অনেকখানা ময়দা নষ্ট করিয়া বহু চেষ্টার পর একটা কিম্ভূতকিমাকার রুটি তৈরী করিয়া নিখিলও হাসিতে লাগিল। বলিল এর আবার দশ-বিশটা ফ্যাংড়া বেরিয়ে গেল, এ হলো না।

সুচিত্রা বলিয়া উঠিল, এসব কাজ তোমার নয়। রাখ, আর বাহাদুরী করে' কাজ নেই।—শীগগীর একটি বিয়ে করে' ফেল, সে তোমায় শিখিয়ে দেবে'খন।

তবে এই রইলো তোমার কাজ, আমি চল্লুম। বলিয়া নিখিল উঠিয়া দাঁড়াইল।

অসিতার মত তুমিও রাগ করে' চল্‌লে নাকি?

হ্যাঁ। বলিয়া নিখিল সেখান হইতে চলিয়া আসিয়া বাহিরের ঘরে কাকাবাবুর নিকট গিয়া বসিল। চন্দ্রনাথ তখন তামাক টানিতে টানিতে কি-একখানা ইংরাজি কেতাব মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতেছিল।

৫

হঠাৎ সেদিন নিখিল সংবাদ লইয়া আসিল যে, ইন্দ্রনাথ কলিকাতায় ফিরিয়াছেন এবং তাঁহার পার্ক ষ্ট্রীটের বাড়ীতে আসিয়া বাস করিতেছেন। কথাটা শুনিবামাত্র চন্দ্রনাথ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া উঠিল। তাহার সহিত কোন সম্পর্ক না রাখিলেও, আজ তাহার এই নিরুদ্দিষ্ট ভ্রাতার আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রনাথের উপর তাহার সমস্ত দ্বন্দ্ব, বিরোধ, সমস্ত প্রভেদ এবং পার্থক্য ভুলিয়া গিয়া চন্দ্রনাথ আকুল আগ্রহে প্রশ্ন করিয়া বসিল, কবে এলেন? তুমি স্বচক্ষে দেখে এলে নিখিল?

রাস্তা দিয়ে আস্‌ছিলুম, দেখ্‌লুম, দরজা জানালা সব খোলা রয়েছে। একটা বেহারাকে জিজ্ঞেস করে' জান্‌লুম, তিনি এসেছেন।

চন্দ্রনাথ কহিল, সেখানে আজই আমার একবার যাওয়া উচিত, —তুমি কি বল?

বেশ, যাবেন। বলিয়া নিখিল চুপ করিয়া রহিল।

আমি টাকা ফিরিয়ে দিয়েছি; সেই থেকে আর যাইও নি। কিছু মনে কোরবেন না ত?

নিখিল বলিল, তবে যেয়ে কাজ নেই।

চন্দ্রনাথ বলিয়া উঠিল, আহা-হা-হা, তুমি ছেলে মানুষ, কিছু বোঝ

না নিখিল। দুদিন বাদে তাঁর মেয়েরই যে বিয়ে! এতে আহ্লাদ যে তাঁরই সবার চেয়ে বেশী,—আমার কি? আমার না আছে স্ত্রী, না আছে মেয়ে, না আছে ছেলে। আমি ত নাঙ্গা বোম্ ফকির। কন্যা-সম্প্রদান যে তাঁকেই কোরতে হয়!

তিনি যদি না করেন?

না করেন, না কোরবেন,—আমি ত দায়ে খালাস! তাহার পর সে কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, ছি, ছি, এ-সময় যদি বৌ'ঠানও থাক্‌তো!… ..বলিয়া সে বাহিরের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল।

এ দুঃখের প্রসঙ্গ কৌশলে চাপা দিবার জন্য নিখিল কহিল, আচ্ছা কাকাবাবু, আপনি না কতদিন বলেচেন, আপনার দাদার দ্বারস্থ আর হবেন না?

এইবার চন্দ্রনাথ একটুখানি জোরে-জোরে বলিয়া উঠিল, হ্যাঁ, বলেচি ত—বলেইচি ত! তোমাদের যে ওই কি-এক কথা। আমি ত ভিক্ষে মাগ্‌তে যাচ্ছি না বাপু! আমাকে যে চেনে, সে ঠিক চেনে। চন্দ্রনাথ চাটুজ্যে অত ছোট লোক নয়!......

নিখিল বলিল, তাহলেও আমার মনে হয়, তিনি এ বিয়ের জন্যে কিছু না দিয়ে থাক্‌তে পারবেন না।

কিন্তু তার দেওয়ার অপেক্ষায় তো আমি বসে' নেই!

অফিস থেকে টাকা তো ধার নিয়েছি! সুচিত্রার গয়নাগুলোও ত নূতন করে' গড়্‌তে দিলুম,—ব্যাস্, আর কি চাই? অরুণের বাবা

যা বলে' গেলেন, সব ত' ঠিক করেই ফেলেছি, এইবার বিয়েটা শুধু বাকী। কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া চন্দ্রনাথ আবার বলিল, তবে কি জান নিখিল, স্বভাবটা আমার ছেলেবেলা থেকেই বড় খারাপ। এই যে আমার দাদা যা করেচেন তা করেচেন, কিন্তু তবু তাঁর মুখখানি একবার করে' না দেখ্‌তে পেলে—বলিতে বলিতে তাহার চোখদুইটা ছল্‌-ছল্‌ করিয়া উঠিল।

নিখিল আর কোন কথা বলিতে পারিল না। চন্দ্রনাথের আর যেন বিলম্ব সহ্য হইতেছিল না, চোখদুইটা হাত দিয়া একবার মুছিয়া লইয়া কহিল, বোধ করি সাড়ে সাতটা বেজেছে,—আমি ফিরে' না আসা পর্য্যন্ত বাড়ীতে থেকো।

কথাটা শুনিবামাত্রই কাকাবাবু যে পার্ক ষ্ট্রীটে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিবেন, নিখিল তাহা ভাবে নাই। বলিল, কেন কাল গেলে হতো না ?

আবার কাল কেন নিখিল ? বিয়ের কথাটা যত শীগ্‌গীর তাঁকে জানিয়ে দি, ততই ভালো। বলিয়া আর কালবিলম্ব না করিয়া বাহির হইয়া যাইবার জন্য চন্দ্রনাথ উদ্যত হইল।

নিখিল বলিল, সুচিত্রাকে একবার জানিয়ে গেলে, হতো না ?

না বাবা, ওকে আর এখন কিছু জানিয়ে কাজ নেই, আমি ফিরে' এসেই বরং বল্‌বো। আমি কতবার দেখেছি, দাদার কথাটা শুন্‌লেই সুচিত্রা-মা আমার কেমন যেন মুস্‌ড়ে' পড়ে।

যাত্রা করিবার পূর্ব্বে সুমুখে দেওয়ালে-টাঙানো রামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের ছবিখানির পানে ঊর্দ্ধ-দৃষ্টিতে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া, চন্দ্রনাথ হাত দুইটি জোড় করিয়া তাঁহার উদ্দেশে একবার নমস্কার করিল, এবং পর-ক্ষণেই চাদরখানা কাঁধে ফেলিয়া দিয়া স্বল্পালোকিত গলিরাস্তার উপর আসিয়া দাঁড়াইল।

চন্দ্রনাথ চলিয়া গেল,—দূরে গলির মোড়ে তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না। নিখিলও ভিতরে না গিয়া, প্রায়ান্ধকার এই বাহিরের ঘরে তক্তার উপর চুপ করিয়া বসিয়া, হঠাৎ যেন অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়া উঠিল।

প্রায় মিনিট পনর পরে কাকাবাবুর ঘরে আলো দিবার জন্য একটা হ্যারিকেন্ লণ্ঠন হাতে লইয়া অসিতা সেই ঘরে প্রবেশ করিতেই দেখিল, কাকাবাবু নাই, অথচ অন্ধকার কক্ষের মধ্যে নিখিল মাথায় হাত দিয়া একাকী কাৎ হইয়া শুইয়া রহিয়াছে। আলোক দেখিয়া সে একবার অসিতার পানে মুখ তুলিয়া তাকাইল, কিন্তু পরক্ষণেই নীরবে মুখ ফিরাইয়া লইল। অসিতার সহিত সেইদিন হইতে তাহার বাক্যালাপ বন্ধ ছিল, কাজেই অসিতাও কোনও প্রশ্ন না করিয়া আলোটা টেবিলের উপর সশব্দে নামাইয়া দিয়া পলায়ন করিল।

উপর হইতে সুচিত্রার গলার স্বর শুনিতে পাওয়া গেল, বলিল, কাকাবাবুর আহ্নিক হলো কি না জিজ্ঞেস করে' আয় লক্ষ্মী বোন্‌টি আমার।

অসিতা উঠানে দাঁড়াইয়া উত্তর দিল, কাকাবাবু এখানে নেই।

সুচিত্রা নিচে নামিয়া আসিল। উভয়ে রান্নাঘরে প্রবেশ করিল। কাকাবাবুর চা, জলখাবার প্রস্তুত করিয়া সুচিত্রা কহিল, কাকাবাবু হয়ত এতক্ষণ ফিরেছেন, এগুলি তাঁকে দিয়ে আয় না ভাই!

অসিতা স্পষ্টাক্ষরে জবাব দিল, আমি পারব না, তুমি যাও।

আজ আবার কি হলো তোর?

অসিতা বলিল, হবে আবার কি? আমি পারবো না, তাই বল্‌চি।

সুচিত্রা নিজেই সেগুলি হাতে লইয়া কাকাবাবুর ঘরের দিকে অগ্রসর হইল।

কাকাবাবুর পরিবর্ত্তে নিখিলকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, সুচিত্রা দরজার নিকট থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। হাসিতে হাসিতে কহিল, ও মা, তাই ত' বলি!—একলাটি অমন চুপ করে' বসে' যে? কাকাবাবু কোথায়?

তিনি বেরিয়ে গেছেন, আস্‌বেন এক্ষুনি।

তুমি ভেতরে যাওনি কেন?

অসিতা এবার তাহলে আমায় ধরে মারবে। বলিয়া নিখিল মুখ তুলিয়া একবার সুচিত্রার পানে তাকাইল।

ঈষৎ হাসিয়া সুচিত্রা বলিল, বাইরের দরজাটা বন্ধ করে রান্নাঘরে এসো তুমি। বলিয়া সে যেমন আসিয়াছিল, তেমনি ফিরিয়া গেল।

বাংলার তরুণ-তরুণী,

ঝড়ের হাওয়ায় যে কয়টি কচি পাতা ঝরিয়া পড়িল, আপনাদের আঙিনায় আজ তাহাই কুড়াইয়া আনিলাম।

ভবানীপুর
২৮শে মাঘ, ১৩৩০

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ঝড়ো হাওয়া

রাত্রি প্রায় নয়টার সময় চন্দ্রনাথ ফিরিল। মুখে হাসি নাই, কথা নাই,—মৌন গম্ভীরভাবে তাহাকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া, নিখিল যেন আভাষে-ইঙ্গিতে কিছু কিছু ঠাহর করিল। কিন্তু সে সম্বন্ধে তাহাকে কোন প্রশ্ন করিতে পারিল না।

সুচিত্রা বলিল, রাত হয়েছে, থাবার ঠাঁই কোর্‌ব কাকাবাবু ?

আমি তাহলে আজ চল্লুম। বলিয়া নিখিল বাহির হইয়া যাইতেছিল।

চন্দ্রনাথ বলিল, না খেয়েই ?

সুচিত্রা টেবিলের নিকট দাঁড়াইয়াছিল, বলিল, ওকে আগেই খাইয়ে দিয়েছি।

বেশ করেছ মা, কিন্তু অনেক রাত হয়ে গেল নিখিল, মাণিকতলা, সে যে এখান থেকে বহুদূর। আজ আর তোমার যেয়ে কাজ নেই।

না। বলিয়া নিখিল বাহির হইয়া গেল।

সুমুখের ছোট গলিটা পার হইয়া সে বড় রাস্তা ধরিয়া চলিতেছিল, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে সহসা কাহার আহ্বানে নিখিল পিছন ফিরিয়া দেখিল, খালিপায়ে ছুটিতে ছুটিতে কাকাবাবু তাহারই দিকে অগ্রসর হইতেছে !

ব্যাপার কিছু বুঝিতে না পারিয়া নিখিল থমকিয়া দাঁড়াইল। চন্দ্রনাথ বলিল, দেখেচো আমার কেমন মনের ঠিক। দাদার কাছে

গেলুম, শেষ পর্য্যন্ত সেখানে কি হলো না হলো, কিছু না বলেই তোমায় ছেড়ে দিচ্ছি।—শোন,—সেখানে যেতেই তো এক বেটা বলে' উঠ্‌লো, 'শ্লিপ্‌' রেখে যান, গিন্নি মার অসুখ, আজ বোধ হয় সাহেবের সঙ্গে দেখা হবে না। আরে রেখে দে তোর সাহেব, আমি যে তার ভাই, সহোদর ভাই রে! সেও শুন্‌লে না, আর আমারও মনটা বড় ছট্‌ফট্‌ করছিল নিখিল,—ভাবলুম, আমি আবার জিজ্ঞেস কোর্‌ব কাকে? নিজেই উপরে গিয়ে দেখে আসি। কিন্তু সিঁড়ি থেকে চাকরটা আমায় জোর করে নামিয়ে দিলে নিখিল, সে দুঃখের কথা আর বলো না। একটা চাকর তাঁর অনুমতি আন্‌বার জন্যে উপরে উঠে গেল, আমি নির্লজ্জের মত সিঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে রইলুম। বেহারার কথা আমি সেখান থেকে শুন্‌তে পাচ্ছিলুম, কাকে যেন সে জিজ্ঞেসা করলে, বাবুর ভাই না কে এসেছেন দেখা কোরবার জন্যে, তাঁকে উপরে আন্‌ব মা-জি! তাঁর উত্তরে তিনি প্রথমে যে কি বললেন, শুনতে পেলুম না, আমার কানে শুধু এই কথাটা এসে বাজ্‌লো,—ভাই তার চোদ্দ-পুরুষের। দেখা আজ হবে না বলে দিগে যা! একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চন্দ্রনাথ আবার বলিল, যাক্‌, চাকরটাকে আর নিচে নেমে আস্‌তে হলো না,—আমি নিজেই ধীরে ধীরে সেখান থেকে বেরিয়ে এলুম।—ছি, ছি, আর আমি সেখানে কোন দিন যাচ্ছি না। আর এ কথাটাও তোমায় আজ বলে' রাখ্‌ছি নিখিল, অসিতার বিয়ের খবরও তাকে দেওয়া হবে না। সে আমাদের ভুলে' গেছে নিখিল, আমরাই বা তাকে ভুল্‌তে পার্‌বো না

কেন? দেখে নিও তুমি, আর যদি কোন দিন আমার মুখে তার নাম পর্য্যন্ত শুনতে পাও তাহ'লে—বলিয়া চন্দ্রনাথ কি একটা শপথ করিতে যাইতেছিল, নিখিল তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, আমি আর ট্রাম পাব না কাকাবাবু, আপনি যান, খেয়ে নিন, রাত অনেক হয়েছে।

নিখিল চলিয়া গেলে, চন্দ্রনাথ ধীরে-ধীরে বাসায় ফিরিল। আজ আর তাহার খাইতে মন ছিল না, তথাপি খাইতে হইল। শয্যায় শয়ন করিল বটে, কিন্তু ঘুম আসিল না। আজিকার এই বিনিদ্র নিশীথে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চন্দ্রনাথ অনেক কথাই ভাবিতে লাগিল। এই বিচিত্র জগতের কত বিচিত্র পরিবর্ত্তন তাহার চোখের সুমুখে সংঘটিত হইল, স্ত্রীর মৃত্যু হইতে আরম্ভ করিয়া কত খণ্ড প্রলয় তাহার মাথার উপর দিয়া বহিয়া গেল, আরও কত বহিবে তাহার ইয়ত্তা নাই। সংসার হইতে দূরে সরিয়া গিয়া নির্লিপ্ত থাকিবার যে দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা তাহার মনে একদিন অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, দাদার মেয়ে দুইটা তাহার সে সাধ মিটিতে দেয় নাই, স্নেহের বন্ধনে শতপাকে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া এমন ভাবে লিপ্ত করিয়া দিয়াছে যে, তাহাদের সে বোঝা মরণের দিন পর্য্যন্ত হাসিমুখে বহন করা ছাড়া তাহার আর নিষ্কৃতি নাই! কিন্তু তাহার মত দুর্ভাগা সে মেয়ে দুইটাকে নিজের মেয়ের চেয়েও ভালবাসিয়াছে বলিয়াই হয়ত তাহাদের দুঃখ দুর্দ্দশার অন্ত নাই! মা তাহাদের মরিয়া গেছে, জন্মদাতা পিতা তাহাদের অপার্থিব ভালবাসা ছাড়িয়া

কোন্ যাদুকরীর মায়ায় ভুলিয়া সোণার বদলে রাংতা কিনিয়াছে, বিধবা হইয়া সুচিত্রা তো বাঁচিয়াও মরিয়া আছে, প্রস্ফুটিত নারী-জীবনের সকল সাধ সকল আকাঙ্ক্ষা, দিনে-দিনে নিষ্ঠুরভাবে পেষণ করিয়া ঝরাফুলের মত তাহারই এই দুইটা চোখের সুমুখে শুকাইয়া যাইতেছে !...এই সব চিন্তার তলায় তাহার দাদার অমানুষিক ব্যবহার চন্দ্রনাথ যতই চাপিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, যতবার ভাবিল এ-সব অঘটন এবং পরিবর্ত্তনের উপর মানুষের কোন হাত নাই,—মানুষ কিছুই করিতে পারে না,—ততবার তাহার মনে একটা অবিশ্বাসের বিষবাষ্প সবদিক অন্ধকার করিয়া ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছিল।

রাত্রি গভীর হইতে গভীরতর হইয়া আসিতে লাগিল। নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতি ঢুলিয়া পড়িল, সমস্ত পৃথিবীর চোখে ঘুম আসিল, তথাপি হতভাগ্য এই চন্দ্রনাথের চোখে তন্দ্রা আসিল না। ক্রমে তাহার নিদ্রালেশহীন চক্ষু দুইটি অসহ্য বেদনায় জ্বালা করিতে লাগিল, সেই জ্বালা ক্রমে তাহার সর্ব্বদেহ মনে পরিব্যপ্ত হইয়া গেল, হৃদয় মন্থন করিয়া উন্মত্ত আবেগে ফেনিল সিন্ধু গর্জ্জিয়া উঠিল,—তাহার সমস্ত শক্তি, সমস্ত সংযম কোথায় উড়িয়া গেল, চন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিল না। বালিসের উপর মুখ গুঁজিয়া দাদার উপর দুরন্ত অভিমানে সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার অসংরুদ্ধ অশ্রু নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহে ঝরিতে লাগিল ! তাহার হৃৎপিণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বাঙ্গের শিরা-উপশিরাগুলা পর্য্যন্ত ধরিয়া কে-যেন সজোরে টানাটানি করিতেছে

বলিয়া মনে হইল, তাহার নিশ্বাস-প্রশ্বাস, বক্ষ-পঞ্জর, মেরুদণ্ড, এমন কি হস্তপদের অঙ্গুলিগুলা পর্য্যন্ত থর্ থর করিয়া সঘনে কম্পিত হইতে লাগিল,—কিন্তু সে এবং তাহার অন্তর্যামী ব্যতীত এই নিশীথ রাতের ঘনান্ধকার ভেদ করিরা প্রৌঢ়ের এই ক্রন্দনধ্বনি পৃথিবীর আর কাহারও কাণে গিয়া পৌঁছিল না !

৬

চন্দ্রনাথ ও নিখিলের মনিব লোকটি অতিশয় ভদ্র। এবং বয়োজ্যেষ্ঠ চন্দ্রনাথ তাঁহার আফিসের কর্ম্মচারী হইলেও, তিনি তাহাকে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। তাই তিনি বিনা সুদে চন্দ্রনাথকে একহাজার টাকা ঋণ দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। অধিকন্তু বিবাহের তিন দিন পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার ও নিখিলের এক সপ্তাহের ছুটি মঞ্জুর করিয়াছেন।

কাল গাত্র হরিদ্রা হইয়া গেছে, আজ রাত্রে বিবাহ। অনাড়ম্বর এই বিবাহের আয়োজন যৎসামান্য হইলেও কাজ অনেক। একা কাকাবাবু কিছুই করিয়া উঠিতে পারিবেন না বলিয়া, গত কয়েক দিন হইতে নিখিলকে তাহার মাণিকতলার 'মেস' পরিত্যাগ করিয়া এই খানেই বাস করিতে হইয়াছে।

কয়েকটা ঠিকা বামুন এবং চাকর ধরিয়া আনিবার জন্য নিখিল আজ অতি প্রত্যুষেই বাহির হইয়া গিয়াছে। বাড়ী-গোছানোর কাজ সুচিত্রা আগে হইতেই ঠিক করিয়া দিয়া, আজ কোমর বাঁধিয়া সকাল হইতেই ভাণ্ডার এবং রান্না-ঘরের সমস্ত জিনিষপত্র গোছাইতেছিল। এই বিবাহ ব্যাপারে নিজের হাতে কাজ করিতে লজ্জা হইতেছিল শুধু অসিতার। অথচ এই দরিদ্র সংসারে তাহারই বা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে কেন? কিন্তু সুচিত্রা তাহাকে নিজে হইতে আজ আর

কোন কাজ করিতে বলিতেছিল না, সেই বা উপযাচিকার মত লজ্জা শরমের মাথা খাইয়া কোন্ কর্ম্মভার দিদির নিকট হইতে চাহিয়া লইবে? ভঁাড়ারে দিদির সাহায্য করিবে বলিয়া অসিতা একবার নিজে নামিয়া আসিতেছিল, হঠাৎ কি ভাবিয়া পুনরায় ফিরিয়া যাইবার জন্য সিঁড়ির উপর থমকিয়া দাঁড়াইল, এমন সময় সুচিত্রা জোরে জোরে ডাকিল, অসিতা! অসিতা!

সে যে সিঁড়ি পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছিল, এই কথাটা গোপন করিবার জন্য একটুখানি দেরী করিয়া অসিতা তাহার দিদির নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। হলুদরঙের শাড়ীখানি আজ তাহাকে বড় সুন্দর মানাইয়াছিল। আস্‌মানী পাথরের দুল্ দুইটি সাপের চোখের মত প্রভাতালোকে জ্বল্ জ্বল্ করিয়া জ্বলিতেছে। আজ তাহার কুমারী জীবনের শেষ দিন,—আজ সে তার চিরবাঞ্ছিত স্বামী লাভ করিয়া নারী হইবে, তাই বুঝি আজ তার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা, সকল সুখ, সকল ভয়, সকল বেদনা, একই কালে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে,—অচির-ভবিষ্যতের সেই শুভলগ্নের প্রতীক্ষাকুল এই অনূঢ়া কুমারীর সর্ব্বাঙ্গে রূপ-মাধুর্য্যে বিকশিত হইয়া পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে!···

কিয়ৎক্ষণ অনিমেষ নয়নে তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া, সুচিত্রা তাহাকে বুকের উপর জড়াইয়া ধরিল। কিসের একটা অব্যক্ত বেদনা তাহার বুকের ভিতর পাষাণের মত চাপিয়া বসিয়া ছিল, কিসের জন্য সে যে তাহাকে ডাকিল, সে কথাটা তাহার যেন আর মনে পড়িতেছিল না।

অবশেষে খানিক ভাবিয়া কহিল, স্কুলে যাদের সঙ্গে পড়েছিস্, তাদের মধ্যে বড় মেয়ে কেউ আছে অসিতা? তোর বন্ধু?

দিদিকে জড়াইয়া ধরিয়া অসিতা তাহার বুকের উপর নিজের মাথাটা এলাইয়া দিয়াছিল,—এইবার ধীরে ধীরে তাহার শরম-চঞ্চল নিবিড় কালো চক্ষু দুইটি উর্দ্ধে তুলিয়া অসিতা বলিল, কেন? নিখিল দা যে বলেছে, কাউকে ডাক্‌তে হবে না?

তা সে বলুক, তুই আছে কি না বল্।

হ্যাঁ, আছে বই কি! মায়া, জাপানী, আরও চার-পাঁচজন আছে।

আচ্ছা বেশ, তুই এক কাজ কর্ ভাই, তাদের মধ্যে যে-দু'জনকে তোর খুশী, চিঠি লিখে আমায় দিয়ে যা, আমি তাদের আন্‌তে পাঠাচ্ছি,—এই জন্যে তোকে ডেকেছিলুম।

অসিতা চিঠি লিখিবার জন্য উপরে যাইতেছিল, সুচিত্রা আর-একবার হাঁকিয়া বলিল, যে-লোক চিঠি নিয়ে যাবে, তারই সঙ্গে আস্‌তে লিখে দে।

ঘাড় নাড়িয়া অসিতা বলিল, বেশ। কিন্তু কে যাবে দিদি?

সে কথা তোকে ভাব্‌তে হবে না রে,—যা তুই।

কোথায় কাকে পাঠাচ্ছো? বলিয়া নিখিল দরজার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যা হয়! সুচিত্রা তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, না, পাঠাইনি কাউকে। তুমি যে জন্যে গিয়েছিলে, পেলে?

হ্যাঁ, দুজন চাকর আর দুজন বামুন আস্‌ছে, আর এই নাও তোমার ঝি এসেছে—একে দিয়ে তোমার কাজ হবে কি না দেখ।—তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ঝি, পেরিয়ে এসো। বলিয়া নিখিল বাহিরের দরজার দিকে তাকাইতেই যে-দৃশ্যটা তাহার নজরে পড়িল, তাহাতে তাহার রাগও যতখানি হইল, দুঃখও তার চেয়ে কম হইল না। দেখিল, বাহিরের ঘরটা পরিষ্কার করিবার জন্য টেবিল ও চেয়ার দুইটা চন্দ্রনাথ নিজেই সদর দরজায় যাইবার চওড়া রাস্তাটার উপর আনিয়া ফেলিয়াছে, এইবার তাহার প্রকাণ্ড কাঠের তক্তাপোষখানা সোজা করিয়া ধরিয়া অতিকষ্টে টানিতে টানিতে দরজা পর্য্যন্ত লইয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু বাহির করিতে পারিতেছে না। প্রাণপণ চেষ্টায় কয়েক্‌বার টানাটানি করিতে গিয়া কবাট ও তক্তার ফাঁকে হঠাৎ তাহার বাঁহাতের একটা আঙুলে চাপ পড়িতেই চন্দ্রনাথ আঙুলটা টানিয়া লইয়া সেই বেদনার্ত্ত অঙ্গুলিটার উপর ঘন ঘন ফুঁ দিতেছিল।

নিখিল তাড়াতাড়ি তাহার নিকট ছুটিয়া গিয়া আঙুলটা পরীক্ষা করিয়া দেখিল, আঘাত তেমন বিশেষ কিছুই লাগে নাই; বলিল, কেন, আপনার কি এ কাজগুলো না করলেই নয় কাকাবাবু? আপনিই যদি কোরবেন, তবে আমি চাকর কি জন্যে আন্‌তে গেলুম? আসুন, সরে' আসুন, সমস্ত দিন আজ উপোস কোরতে হবে, তার উপর এই সব—বলিয়া সে নিজেই হিড়্ হিড়্ করিয়া তক্তাটাকে টানিয়া বাহিরে আনিয়া ফেলিয়া দিল।

কথাগুলা নিখিল এত জোরে জোরে বলিয়াছিল যে, উপর হইতে অসিতা এবং ভাঁড়ার হইতে সুচিত্রা, এমন কি নূতন ঝিটা পর্য্যন্ত ছুটিয়া সেখানে জড় হইয়া গেল। সুচিত্রা কাকাবাবুর বেদনার্ত্ত অঙ্গুলিটা তুলিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোন্‌খানে লাগ্‌লো ?

একে তাহার মনটা আজ সকাল হইতেই ভাল ছিল না, তাহার উপর নিখিলের কথার উত্তরে কোন কিছু বলিতে না পারিয়া এবং এমনভাবে অপদস্থ হইয়া চন্দ্রনাথ বোধ করি মনে মনে একটুখানি রাগ করিয়াই নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। এইবার সুচিত্রা, অসিতা, নিখিল সকলে মিলিয়া যখন তাহাকে 'কতখানি লাগিল' 'কেন লাগিল' 'কোথায় লাগিল' ইত্যাদি প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল, তখন সে আর সামলাইতে পারিল না, জোরে-জোরে বলিয়া উঠিল, লাগেনি আমার, বল্‌ছি আমি হাজার বার,—আমার লাগেনি, তবু তোরা চেঁচাতে ছাড়্‌বিনে। আর, ওই এক হয়েছে নিখিল, আমাকে সরিয়ে দিয়ে তুমিই বা বাপু ওসব নিয়ে লেগে পড়্‌লে কেন ? আমি না হয় চোট্‌ লাগ্‌লেও চুপ করে বসে থাক্‌তে পারবো, কিন্তু তোমার যে আবার ছুটাছুটি কোরে মরতে হচ্ছে,—তোমার লাগ্‌লেই তো সর্ব্বনাশ।…

এমন সময় সদর দরজা ঠেলিয়া খালি গায়ে জন দুই চাকরের মত ছোক্‌রা প্রবেশ করিতেই, সুচিত্রা ও অসিতা সরিয়া গেল ; চন্দ্রনাথ কহিলেন, এই নাও নিখিল, তোমার চাকর এসেছে,—কি হে, তোমরা এখানে কাজ কোর্‌বে ত ?

'বাঁশরী' পত্রিকায় 'ঝড়ো হাওয়া' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু সে পুস্তকখানির সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। তাহার নামগুলি মাত্র রাখিয়া 'ঝড়ো হাওয়া' আবার নূতন করিয়া লিখিলাম।

'ঝড়ো হাওয়ার মধ্যে যে সব চরিত্রের অবতারণা করা হইয়াছে, সকলেই আমার মানস-প্রসূত; কাহাকেও ইঙ্গিত করিয়া কিছু লিখি নাই।

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

একজন বলিল, হ্যাঁ বাবু, সামন্ত-সাহেব এখানে বিয়ে বাড়ীতে কাজ করবার জন্য আমাদের পাঠিয়ে দিলেন। বলিয়া এক টুকরা ছোট কাগজ তাহার হাতে ফেলিয়া দিল।

সামন্ত সাহেব? আমার মনিব? বলিয়া চন্দ্রনাথ যেন আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। দেখিল, কাগজের উপর তিনি লিখিয়া দিয়াছেন,—চন্দ্রনাথ বাবু,

আমার বাড়ীর এই চাকর দুইজনকে পাঠাইলাম—তাহাদের কাজে লাগাইয়া দিবেন। অন্য কোন জিনিসপত্রের প্রয়োজন হইলে লিখিয়া পাঠাইবেন। আমি সন্ধ্যার পর বর-কনে দেখিয়া আসিব।

শ্রীপ্যারিমোহন সামন্ত।

সামন্ত-সাহেবের নাম শুনিয়া নিখিল ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল। চন্দ্রনাথ কহিল, দেখেছ বাবা নিখিল, কি রকম ভদ্র। সৎবংশের ছেলে বাবা, কেনই বা হবে না বল? ভগবান তাঁকে আরও সুখ সম্পদ দিন,—আমি চিরকাল তাঁর গোলাম হয়ে থাক্‌বো।

সুচিত্রা একটুখানি ভাবিয়া বলিল, ভাঁড়ারের সব জিনিসই তো এসেছে,—পুরুত যা ফর্দ্দ দিয়েছিলেন, তাও তো এনেছ,—আর কি চাই, তুমিই একটু ভেবে দেখ না? মার্কেটে তোমার সেই গোকুলবাবুর দোকান থেকে যদি কিছু ফুল আন্‌তে পার, তাহ'লে ভাল করে' মালা গেঁথে দি।

নিখিল বাহির হইতেছিল, চন্দ্রনাথ ডাকিয়া কহিল, কোথায় যাচ্ছ নিখিল? তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ করতুম।

কি, বলুন। আমি ফুল আন্‌তে যাচ্ছি।

চন্দ্রনাথ বলিল, যা হবার, তা তো হয়েছে। কিন্তু আমার কি আর এ সময় রাগ করে থাকা উচিত? দাদার কাছে আর একবার গেলে হতো না?

নিখিল বলিল, শুন্‌লুম্, সুচিত্রা না কি তাঁকে একখান চিঠি লিখেছে।

চন্দ্রনাথ আগ্রহ সহকারে বলিয়া উঠিল, লিখেছে? চিঠি দিয়েছে, তোমায় সে বল্‌লে?

হ্যাঁ।

আচ্ছা দাঁড়াও, তাকে একবার জিজ্ঞেস্ করে নি। সুচিত্রা! সুচিত্রা!

সুচিত্রা ভাঁড়ারের দরজায় তালা বন্ধ করিতেছিল, কাকাবাবুর ডাক শুনিয়া বলিল, আমায় ডাক্‌ছো কাকাবাবু?

হ্যাঁ মা, ডাক্‌চি,—শোন ত একবার।

সুচিত্রা কাছে আসিয়া দাঁড়াইলে চন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিল, দাদাকে কি তুমি চিঠি দিয়েছ সুচিত্রা? অসিতার বিয়ের কথা লিখেছ ত?

হ্যাঁ লিখেছি।

চন্দ্রনাথ বলিল, তবে আর কিছু কোরতে হবে না,—কি বল বাবা নিখিল?—যাও তবে ফুল না কি আন্‌তে যাচ্ছিলে যাও। এই জন্যেই ডাক্‌ছিলুম।

ঘণ্টা দেড়েক্ পরে নানাবিধ ফুলে একটা ঝুড়ি ভর্ত্তি করিয়া লইয়া নিখিল ফিরিয়া আসিল। দরজায় প্রবেশ করিতে যাইবে, এমন সময় একটা ছ্যাকড়া গাড়ী দাঁড়াইবার শব্দে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, গাড়ীটা তাহাদের দরজার নিকটেই আসিয়া দাঁড়াইল। খোলা জানালার মধ্য দিয়া দেখিতে পাওয়া গেল, একজন যুবক এবং জন দুই স্ত্রীলোক ভিতরে বসিয়া আছেন। যুবক গাড়ীর ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিল, এটা কি ত্রিশ নম্বর বাড়ী মশাই?

নিখিল বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ,—আসুন। বলিয়াই ঘরের ভিতর হইতে তাড়াতাড়ি ঝিকে ডাকিয়া দিয়া ফুলের ঝুড়িটা লইয়া নিখিল দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া গেল। সম্মুখে অসিতাকে দেখিতে পাইয়া নিখিল কহিল, তোর দিদি কোথায় রে?

আমি জানি না। বোধ হয় ও-ঘরে আছেন। বলিয়া অসিতা পাশের ঘরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দিল।

সুচিত্রার পায়ের কাছে ফুলের ঝুড়িটা সজোরে নামাইয়া দিতেই সুচিত্রা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, পায়ের কাছে নামিয়ে দিলে, আমায় পূজো কোরবে নাকি ?

হ্যাঁ কোরব। কিন্তু তোমার এ কি কাণ্ড বল ত ? দেশ সুদ্ধ নিমন্ত্রণ করে বসেছ ? জান না, আমি কেন বারণ করেছিলুম ? সখ করে কি বলেছিলুম ?

তা জানি। তোমার বৌ থাকলে হয়ত' আর কাউকে ডাকবার দরকার হতো না। বিয়ের কোনও কাজে যে আমার হাত দেবার জো নেই,—সে কথাটা তুমি বার-বার ভুলে' যাও কেন বল ত ? আমার যে—বলিতে বলিতে সুচিত্রার কণ্ঠস্বর এরূপ অস্বাভাবিকভাবে বেদনায় বিকৃত হইয়া গেল যে, কথাটা আর শেষ করিতে পারিল না এবং শ্রোতার শুষ্ক মুখখানা দেখিয়া এ কথাটাও তাহার বুঝিতে বাকি রহিল না যে, ব্যথা উভয়ের বুকেই সমান বাজিয়াছে! নিখিলের ইহা মনে ছিল না, থাকিলে হয়ত' এ আঘাতের বিনিময়ে আঘাত গ্রহণ করিত না।

ঝিকে সঙ্গে লইয়া আগন্তুক রমণীদ্বয় ইতিমধ্যে উপরে উঠিয়া আসিয়াছিলেন ; বাহিরে অসিতার সহিত তাঁহাদের কথোপকথন শুনিতে পাইয়া নিখিল ধীরে-ধীরে বাহির হইয়া গেল।

প্রাঙ্গণের উপর চাঁদোয়া টাঙাইয়া বিবাহ-মণ্ডপ প্রস্তুত করা হইয়াছিল। সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই ইন্দ্রনাথ মোটরে চড়িয়া আসিয়া উপস্থিত

হইলেন। দারুণ গ্রীষ্মেও তাঁহার মাথায় একটা গরম র‍্যাপার বাঁধা এবং হাতে একটা মোটা লাঠি। অতি কষ্টে হাঁটিতে হাঁটিতে তিনি প্রথমেই সুচিত্রা এবং অসিতাকে একবার দেখিয়া আসিলেন এবং পরক্ষণেই মণ্ডপের একপার্শ্বে আসিয়া চুপ করিয়া বসিলেন।

কন্যা-সম্প্রদান করিবে বলিয়া চন্দ্রনাথ আজ উপবাস করিয়াছিল, কিন্তু তাহার উপবাসের কষ্ট, দাদাকে অকস্মাৎ এত নিকটে পাইয়া কোন্ দিক দিয়া যেন উবিয়া গেল।—মনে হইল, বিবাহের আনন্দটুকু এতক্ষণে সে বুঝিতে পারিতেছে এবং দায়-ঝক্কির বোঝাটা যেন আর একটা সক্ষম স্কন্ধে চড়াইয়া দিয়া নিমেষেই সে নির্ভয় নিশ্চিন্ত হইয়া গেছে!

বর এবং বরযাত্রী আসিবার পূর্ব্বেই চন্দ্রনাথ বলিল, দাদা, তুমি যখন এলে, তখন তোমারই ত কন্যা সম্প্রদান করা উচিত,—তুমিই কর।

ইন্দ্রনাথ মাথার পাগ্‌ড়িটা একটুখানি ভাল করিয়া বাঁধিয়া লইয়া বলিলেন, তুই কি পাগল হয়েচিস্ চন্দ্রনাথ,—বাতের শরীর, উঠ্‌ বোস্ কোরতেই মরে যাব তাহ'লে। তুই-ই কর্ না ভাই। তাতে আর কি হয়েচে?—বলিতে বলিতে ক্লান্তি এবং অসুস্থতার অবসাদ-চিহ্ন তাঁহার সর্ব্বশরীরে ফুটিয়া উঠিল।

ঠিকায় চুক্তি করিয়া যে পুরোহিত ঠাকুর আসিয়াছিলেন, তিনি এতক্ষণ অদূরে বসিয়া ইন্দ্রনাথকে কন্যা-কর্ত্তা ঠাওরাইয়া, শাস্ত্রের বচন

আওড়াইয়া এবং দু' একটা মিষ্টি মিষ্টি চাটুবাদে তাঁহার নিকট হইতে কিছু উদ্বৃত্ত পাওনার ব্যবস্থা করিতেছিলেন, হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, দেখুন দেখি, আপনার এমন অসুখ, মুখখানা পর্য্যন্ত শুকিয়ে গেছে,—বেশ ত', বেশ ত' ছোট ভাই-ই সম্প্রদান কোরবেন্। শাস্ত্রে এর বিধি আছে। আতুরে নিয়মো নাস্তি।

অবশেষে তাহাই স্থির হইল।

এই বিবাহের জন্য অরুণের পিতা উমেশবাবু দিন দুয়েকের জন্য কলিকাতার শ্যামবাজারের দিকে একটা বাসা ভাড়া করিয়াছিলেন। রাত্রি নয়টার মধ্যেই বর লইয়া বরকর্ত্তা, এবং বরযাত্রিগণ সকলেই প্রায় একে-একে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অরুণের সহপাঠী দুই-চারিজন বন্ধু ব্যতীত সকলেই প্রায় দেশ হইতে আসিয়াছেন।

দেখিতে দেখিতে লোকজনের সমাবেশে মণ্ডপ ভরিয়া গেল, কথায়-বার্ত্তায়, হাঁকে-ডাকে, আলাপে-আপ্যায়নে এবং মধুর-তীব্র সমালোচনায় বিয়ে বাড়ীর কোলাহল বেশ বাড়িয়া উঠিল। উমেশবাবু ও ইন্দ্রনাথ, এই দুই বৈবাহিকে রীতিমত আলাপ-পরিচয় সুরু করিয়া দিলেন।

যাহাতে এই এতগুলি অভ্যাগতের কোনরূপ কষ্ট না হয় এবং কোন দিক দিয়া কোনও ত্রুটি না হইতে পারে চন্দ্রনাথ তাহাই দেখিবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, এবং সমস্ত দিন অনর্থক হাঁক্ ডাক, চীৎকার করিয়া গলা ধরাইয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু ইন্দ্রনাথ আসিবার পর হইতে একটি চোখ তাহার এত গোলমালের

মাঝেও তাহারই দিকে উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল। তাহার দাদাই যেন তাহার নিজের ঘরেই সব চেয়ে বড় অতিথি হইয়া পড়িলেন।

অন্দরে সুচিত্রা এবং বাহিরে নিখিল কাজ করিতেছিল। তাহারা দুজন না থাকিলে আজিকার এই উৎসব হয়ত’ পণ্ড হইয়া যাইত। নিখিলের মনে হইতেছিল, এ কাজ যেন ইন্দ্রনাথের নয়, চন্দ্রনাথের নয়, অসিতার নয়, অরুণের নয়, তাহার নয়, এ কাজ যেন সুচিত্রার! তাই সে আজ এত দিন পরে সুচিত্রাকে সেবা করিবার অবসর পাইয়া ধন্য হইয়াছে! আজ সে প্রাণ-মন দিয়া, শরীরের সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য দিয়া তাহার সেবা করিবে,—কোথাও এতটুকু ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিতে দিবে না! আজিকার এই বিবাহ-উৎসব সুচারুরূপে সুসম্পন্ন করিয়া যদি সে তাহার মনে এতটুকু আনন্দও দিতে পারে, তাহা হইলে তাহার এই প্রাণপাত পরিশ্রম সফলতা মণ্ডিত হইয়া উঠিবে!

কন্যা-সম্প্রদান ইত্যাদি যাবতীয় অনুষ্ঠান শেষ হইতে না হইতে, বরযাত্রী এবং অন্যান্য সমাগত অতিথিগণের আহারের ঝঞ্ঝাট,—প্রায় চুকিয়া আসিল। তাহাদের ডাকা-হাঁকা এবং পরিবেশন, নিখিল নিজেই সবদিক বন্দোবস্ত করিতেছিল। ইন্দ্রনাথের শরীরের অসুস্থতা সত্ত্বেও লাঠি ধরিয়া তিনি সমস্ত দেখিয়া বেড়াইতেছিলেন। যে ছোক্‌রা তাঁহার বাড়ীতে মোড়লী করিতেছে এবং সবদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া যে সব চেয়ে বেশী কাজ করিতেছে, সেই নিখিলকেই ইন্দ্রনাথ চিনিতেন না, কিন্তু চতুর ইন্দ্রনাথ আজিকার এই অভিনয়ের মুহূর্ত্তে তাহার পরিচয়

জানিতে গিয়া নিজে ধরা দিলেন না,—আভাসে-ইঙ্গিতে তাহার নামটা জানিয়া লইলেন মাত্র। কোথাও কোন ত্রুটি দেখিলে তিনি বলিতে-ছিলেন, নিখিল, এইখানে অমুক জিনিস দিয়ে যাও তো বাবা!

অরুণ এবং একটা চাকরকে রাখিয়া দিয়া, অন্যান্য বরযাত্রীদিগকে লইয়া রাত্রি প্রায় একটার সময় উমেশবাবু বিদায় লইলেন। এতক্ষণে বাড়ীটা যেন একটুখানি নিস্তব্ধ হইল।

ইন্দ্রনাথের মোটর তখনও বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল, তিনি বলিলেন, চন্দ্রনাথ, আমি তাহ'লে চল্লুম।

এমন সময় যে তিনি একটুখানি জল পর্য্যন্ত না খাইয়া চলিয়া যাইবেন, চন্দ্রনাথ তাহা ভাবিতে পারে নাই. সংবাদ শুনিয়া মুখখানি তাহার শুকাইয়া গেল, বলিল, সে কি হয় দাদা, এখনও পর্য্যন্ত একটু জল মুখে দিলে না,—আজ আর যেতে হবে না।

তুই জানিস্ নে চন্দ্রনাথ, এত রাত্রি জেগে কিছু খেলেই ত আমি মরে' যাব। নে, এইটা রাখ্। বলিয়া ইন্দ্রনাথ পকেট হইতে পাঁচশ' টাকার একখানা চেক্ বাহির করিয়া চন্দ্রনাথের হাতে দিয়া কহিলেন, আরও যদি কিছু দরকার হয়, এর পর দেব। চেক্‌খানা চন্দ্রনাথের নামে তিনি লিখিয়া আনিয়াছিলেন।

চন্দ্রনাথ জানিত, নিষেধ তিনি শুনিবেন না, কাজেই অনর্থক আর কিছু না বলিয়া দাদার মুখের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। ইন্দ্রনাথ বাহিরে গিয়া মোটরে চড়িলেন, মোটর ছাড়িয়া দিল। চন্দ্রনাথ তাঁহার

সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিয়া পথের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া নিস্তব্ধ মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে বিবাহ বাড়ীর সমস্ত কোলাহল প্রায় নিস্তব্ধ হইয়া গেল। উপরের একটা ঘরে সুচিত্রা ও অসিতার বন্ধুগণ বর-কন্যা লইয়া বাসর জাগাইতেছিল।

নিখিল আজ কয়েক দিন ধরিয়া ক্রমাগত প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া বড় বেশী ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার মনে হইতেছিল, এইবার যেন সে একটুখানি ঘুমাইতে পারিলেই বাঁচে।

চন্দ্রনাথ একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, যাক্ সব চুকে গেল। তুমি এইবার খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড় বাবা,—আর ছুটে বেড়িয়ো না নিখিল! ক'দিন ধরে যে তোমার খাটুনি হচ্ছে—

নিখিল বলিল, তা হোক্, আপনি খেয়েছেন?

হাঁ।

যান্ তবে আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন, আমার জন্যে ভাবতে হবে না। বলিয়া নিখিল তাহাকে বিদায় করিয়া, নিচেকার একটা ঘরে গিয়া হাত-পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল। খাইতে তাহার ইচ্ছাও ছিল না এবং এক একবার মনেও হইতেছিল, যাহার জন্য সে এত করিল, সেই সুচিত্রা তাহাকে আজ না ডাকিয়া খাওয়াইলে সে খাইবে না।

আজিকার এই আনন্দোৎসবের জন্য সুচিত্রা বহুদিন হইতেই প্রস্তুত হইতেছিল। গত কয়েক দিন ধরিয়া নিখিলের মত সেও

ঝড়ো হাওয়া

১

মাণিকতলার একটা গলির ভিতর একটা মস্ত বড় ভাঙা পুরাতন বাড়ী পড়িয়া ছিল। ভাড়াটিয়া আসিত, কিন্তু পনর দিন কিংবা এক মাসের বেশী কেহ সেখানে টিকিতে পারিত না; লোকে বলিত, ভুতুড়ে বাড়ী। অবশেষে, বাড়ীর মালিক এক ফন্দি আঁটিলেন,—'মেস্' কিংবা 'বোর্ডিং'এর জন্য ভাড়া দেওয়া হইবে বলিয়া বাড়ীর বাহিরে একটা কাগজের প্ল্যাকার্ড ঝুলাইয়া দিলেন। কলিকাতা শহরে লোকের অভাব হইল না। দিন কতক পরে দেখা গেল, জন কতক অফিসের কেরাণী এবং দোকানের কর্ম্মচারী মিলিয়া সেই পড়ো স্যাঁৎসেতে বাড়ীটায় একটা মেস্ খুলিয়া বসিয়াছে। তিন-চার দিনের মধ্যেই বাড়ীটার সমস্ত ঘরগুলাই ভর্ত্তি হইয়া গেল এবং সেই অবধি নির্ব্বিবাদে সুস্থ শরীরে সকলেই সেখানে বাস করিতে লাগিল। তাহার পর-বৎসর একদা এক বৈশাখী-বৈকালে ভয়ানক ঝড় উঠিয়াছে, সমস্ত শহরটা অন্ধকার করিয়া আকাশে কালো মেঘ ঘন হইয়া উঠিতেছিল,—ক্ষণে

তাহার দেহ-মনের বিশ্রামকে নিষ্ঠুরভাবে জবাই করিয়াছে,—শ্রান্তি ক্লান্তি ভুলিয়া সে যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। অরুণকে সে যে কতবার কতরকম করিয়া দেখিল, তাহার ইয়ত্তা নাই,—মেয়েরা যখন সকলে মিলিয়া অসিতাকে অরুণের পার্শ্বে বসাইয়া দিয়া হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল, বরকে ইঙ্গিত করিয়া কত রকমের হাসি-ঠাট্টা আমোদ-আহ্লাদ করিতে আরম্ভ করিল, সুচিত্রা তখন দরজার পর্দ্দাটা সরাইয়া দিয়া তাহারই একপার্শ্বে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, যাহার হাতে সে অসিতাকে চির-জীবনের মত তুলিয়া দিল, সে কেমন, তাহাকে মানাইয়া লইয়া অভিমানিনী অসিতা সুখে-স্বচ্ছন্দে নূতন সংসার পাতাইতে পারিবে কি না।......

অরুণের মনটা যে কেমন তা ভগবান জানেন, কিন্তু দেখিতে তো বেশ সুন্দর সু-পুরুষ! হাতের রিষ্ট্‌ওয়াচ্‌টা বেশ মানাইয়াছে, মুখখানিও বেশ ঢল্‌ঢলে; চোখ দুটি নিখিলের মত সুন্দর না হইলেও এও মন্দ নয়। নিখিলের মতই যে সকলকে হইতে হইবে, তাহারই বা মানে কি?...... হঠাৎ কি একটা কথা তাহার মনে হইতেই সুচিত্রা আর সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি নিচে নামিয়া আসিল। বাহিরের যে ঘরটায় কাকাবাবু থাকিতেন, আজ সে ঘরে বরযাত্রীদের বসিবার জায়গা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সুচিত্রা প্রথমে সেই ঘরে গিয়া দেখিল, চন্দ্রনাথ একাকী একটা গোল তাকিয়ার উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছে। পাশের অন্যান্য ঘরগুলা খালি পড়িয়া রহিয়াছে। ভাঁড়ারের পাশে যে ছোট ঘরটায় মাটির গ্লাস, বাটি, কুশাসন এবং জলের

হাঁড়ি রাখা হইয়াছিল, সুচিত্রা দরজা ঠেলিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিতেই উঠানের 'পাঞ্চ-লাইটে'র খানিকটা আলো মুক্ত দরজার পথে ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িল, দেখিল, মেঝের উপর কতকগুলা কুশাসন বিছাইয়া নিখিল হাতের উপর মাথা রাখিয়া শুইয়া আছে। কতকগুলা মাটির বাসন ঘরের এককোণে জড় করিয়া রাখা হইয়াছে, কতকগুলা বা ভাঙিয়া চুরিয়া সমস্ত ঘরের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া গেছে, ফুটা একটা জলের কল্সির তলা হইতে খানিকটা জল নিখিলের ঠিক মাথার পাশ দিয়া গড়াইয়া যাইতেছে। সুচিত্রা ঈষৎ হাসিল। নিখিল হয়ত' এখনও জাগিয়া আছে ভাবিয়া সে তাহার কাছে গিয়া একটা মাটির গ্লাস পা দিয়া সরাইয়া একটুখানি শব্দ করিল। নিখিল সত্যই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সে শব্দ তাহার কানে গেল না। এইবার সে আর একটু কাছে গিয়া বলিল, নাও ওঠ। তোমার দুষ্টুমি আমি বুঝেছি। না খেয়েই পড়ে আছ তা জানি।

নিখিলের নিকট হইতে এবারেও কোন সাড়া না পাইয়া সুচিত্রা কিয়ৎক্ষণ তাহার আলোকোজ্জ্বল মুখের পানে তাকাইয়া রহিল এবং পরক্ষণেই ধীরে ধীরে তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া ডাকিল, এই! নিখিল!

এতক্ষণে নিখিলের ঘুম ভাঙ্গিল, চোখ মেলিয়া বলিল, কেন? কি বল্‌চো?

ঈষৎ হাসিয়া সুচিত্রা বলিল, এখানে শুতে পাবে না, রান্নাঘরে এঁটো বাসনগুলো আগ্‌লে থাক্‌তে হবে চল।

না, কি বলচো বল, আমার ভয়ানক ঘুম পাচ্ছে।

তা ত' পাবেই, কিন্তু খেয়ে ঘুমোতে হয় তা জান না বুঝি?

আজ আর খাব না, খেতে তেমন ইচ্ছা নেই!

ঘুমোবার আগে ইচ্ছা ছিল বোধ হয়? না থাকলেও অনেক সময় খেতে হয়; ওঠ।

তোমার সঙ্গে কে পারবে? চল। বলিয়া ঈষৎ হাসিয়া নিখিল উঠিয়া বসিল।

সুচিত্রা বলিল, এইখানেই বসো, ভাঁড়াড়ের চাবি কোথায় রেখেছ, দাও।

সুমুখের জানলার দিকে নিখিল অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।

চাবি লইয়া সুচিত্রা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

নিখিল এই ঈষৎ অন্ধকার ঘরের মধ্য হইতে একবার বাহিরের দিকে তাকাইল। উৎসব শেষে বাড়ীটা যেন থম্ থম্ করিতেছে!—আলোটা কিন্তু তখনও তেম্নি তীব্রভাবে জ্বলিতেছিল! এই তীব্রোজ্জ্বল আলোকশিখার দিকে তাকাইয়া নিখিলের মনে হইল, শুধু আলো থাকিলেই তো চলে না! কিছুক্ষণ পূর্ব্বে এই আলোকের নিচে যাহারা সমবেত হইয়াছিল, কথায়-বার্ত্তায়, হাস্য-পরিহাসে যাহারা এই নির্জ্জন স্থানটাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটা রূপ দিয়াছিল, এবং যাহাদের কল্যাণে এই আলোকিত প্রাঙ্গণের উপর এতক্ষণ ধরিয়া জীবনের গতি স্রোত আনন্দ-কোলাহল-মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল,—তাহারা একে

একে সকলেই চলিয়া গিয়াছে,—শুধু এই আলোটা এখনও এই নিস্তব্ধ অঙ্গনের উপর জ্বলিয়া মরিতেছে!......বিধবা তরুণীর প্রাণ-শিখার মত এই জ্যোতি-শিখা, হয়ত তাহার যতক্ষণ পরমায়ু থাকিবে, ততক্ষণই জ্বলিবে!......

হঠাৎ সুচিত্রা ঘরে প্রবেশ করিল। খাবারের থালা এবং লণ্ঠনটা দরজার পার্শ্বে নামাইয়া রাখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, আমার হাতে একটু জল দিতে পারবে?

নিখিল বলিল, কেন?

তুমি দাও না কল্‌সি থেকে গড়িয়ে। এঁটো হাতে তোমার ঠাঁই কোর্‌ব কেমন করে?

ঠাঁই কোরতে হবে না, ও আমি নিজেই করে' নিচ্ছি। বলিয়া নিখিল তাহার কুশাসনে-সজ্জিত অপূর্ব্ব শয্যা হইতে একটা ভিজা এবং অর্দ্ধছিন্ন আসন টানিয়া আনিয়া একটু দূরে পাতিল;—হাতের কাছে দেখিল, কান-ভাঙা একটি ফুটো গ্লাসের তলায় তখনও একটুখানি জল রহিয়াছে, সযত্নে গ্ল্যাসটি হাতের কাছে লইয়া বসিল। বলিল, ভারি তো ঠাঁই করার হাঙ্গাম্‌,—এইবার কি দেবে দাও।

নিখিলের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সুচিত্রা বাহির হইয়া গিয়াছিল এবং কলতলায় হাত ধুইয়া নিখিলের কাছে আসিয়া দেখিল, গ্ল্যাসের অবশিষ্ট জলটুকু, ইতিমধ্যে ফুটা দিয়া নিঃশেষে বাহির হইয়া

যাইবার উপক্রম করিয়াছে। একটু হাসিয়া আস্তে-আস্তে গ্ল্যাসটি বাহিরের উঠানে ছুড়িয়া দিয়া বলিল, ওঠ ত একবার!

আঃ, উঠে আর কি হবে? বলিতে বলিতে নিখিল উঠিয়া দাঁড়াইল।

ভিজা আসনটা সুচিত্রা টান মারিয়া ফেলিয়া দিতেই নিখিল বলিয়া উঠিল, আসনটা ভিজে ছিল নাকি? তা ত দেখিনি। এবং পরক্ষণেই হাত দিয়া দেখিল যে, তাহার কাপড়খানা প্রায় অনেকটা ভিজিয়া গিয়াছে।

সুচিত্রা হাসিতে হাসিতে ঘরের অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার স্থানটার উপর আসন বিছাইয়া আঁচল দিয়া ধূলা ঝাড়িয়া দিল এবং একগ্ল্যাস জল ও খাবার থালা, বাটি, নামাইয়া দিয়া বলিল, বসো এবার। মানুষটি না পারে এমন কাজ নেই, অথচ এই নিজের বেলাতেই যত গোলমাল। একলা মানুষের এ সব গুলো জানা দরকার।

না জান্‌লেও ত' কিছু আট্‌কায় না। বলিয়া নিখিল খাইতে বসিল।

খাইতে খাইতে নিখিল বলিল, কিন্তু এত আমি খেতে পার্‌ব না।

না পার, ফেলে' দেব।

খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় নিখিল সুচিত্রার মুখের পানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, অরুণকে কেমন লাগ্‌লো তোমার?

সুচিত্রা বলিল, নিজের ভগ্নিপতি, বোধ হয় খারাপ হলেও ভালো লাগে।

খারাপ তো নয় ?

ঘটক তুমি, সে কথা আমার চেয়ে তোমারই বেশী জানা উচিত।

নিখিল এইবার প্রশ্ন করিল, আমায় তো খাওয়াচ্ছো বেশ। কিন্তু নিজে খেয়েছ ?

ঈষৎ হাসিয়া সুচিত্রা বলিল, তাও ভালো। এতক্ষণে তোমার মনে পড়েছে !......

না সত্যি বল, খেয়েছ ?

না আমি খাব না।

নিখিল বলিল, নিজে না খেয়ে পরকে খাওয়ানো কেন ? আমিও খাব না।

সুচিত্রা পরিহাসের স্বরে বলিল, খাওয়া শেষ হলে ও-কথা সবাই বল্‌তে পারে।

বেশ, তবে আর কিছু জিজ্ঞেস কোর্‌ব না। বলিয়া নিখিল উঠিল।

সুচিত্রা হাসিতে হাসিতে বলিল, এবার আর এখানে তোমার রাজশয্যা বিছিয়ো না যেন। কলতলায় জল আছে, আঁচিয়ে শীগ্‌গির উপরে এসো। বিছানা করে দিচ্ছি—শোবে।

নিখিল বলিল, না, আমি এইখানেই বেশ থাক্‌ব। পার ত' একটা মাদুর আর একটা বালিশ দিয়ে যাও।

সুচিত্রা এইবার একটুখানি উত্তেজিত হইয়া বলিল, আর জ্বালিয়ো না বল্‌চি। একাদশীর উপোস করে' দশবার ওঠা-নামা কোরতে কষ্ট হয়—তা জান ?

অকস্মাৎ নিখিলের বুকে কে-যেন সজোরে আঘাত করিল। স্তব্ধ নির্ব্বাক্ হইয়া সে একবার পিছন্ ফিরিয়া সুচিত্রার দিকে তাকাইল বটে, কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইল না,—সে তখন সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গিয়াছে।

৮

জীবনে কোন দিন পল্লীগ্রাম দেখিবার সৌভাগ্য অসিতার হয় নাই। আজ সে বিবাহের পর, আশা এবং আনন্দ উদ্বেলিত হৃদয়ে স্বামীর সহিত পাল্কী চড়িয়া প্রথম পল্লী পথে চলিতে চলিতে কত কথাই না ভাবিতেছিল। জীবনে সে কত অভিজ্ঞতা লাভ করিবে, কত নূতন জিনিস দেখিবে, কত নূতন সখী পাইবে, শ্বশুর-শ্বাশুড়ীকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিবে, সেবা শুশ্রূষা করিবে এবং জীবনের চির সহচর এই স্বামীকে লইয়া এক নূতন সংসার পাতাইবে!......নব বিবাহিত জীবনের আনন্দ এবং নূতনত্বের মোহ এক দিকে যেমন অসিতাকে সম্মুখের দিকে টানিতেছিল, অন্য দিকে তেমনি একটা অজানা ভয় এবং আতঙ্কে সে এক-একবার পিছু হাঁটিতে লাগিল,—না জানি সে কোথায় চলিয়াছে, যাহাদের সে কখনও চোখে দেখে নাই, যাহাদের সমাজ, সংস্কার এবং জীবনযাত্রা প্রণালীর সহিত আদৌ তাহার পরিচয় নাই,—তাহাদের সংস্রব, সাহচর্য্য ভাল লাগিবে কি না এবং সেখানে তাহার নারীজীবনের পরিপূর্ণ সফলতা কোথায় কেমন ভাবে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহা সে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে কি না, সেই ভাবনাই ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিতেছিল।

মেঠো রাস্তা দিয়া পাল্কী চলিয়াছে,—দুধারে সুবিস্তীর্ণ ধানের মাঠগুলা খাঁ-খাঁ করিতেছে, মাঝে মাঝে দু'একটা বড় বড় গাছ প্রকাণ্ড

শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে,—দূরে কতকগুলা গাছের ফাঁকে-ফাঁকে কয়েকটা খড়ো-ঘর দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল, বোধ করি ঐটাই তাহার শ্বশুরালয়!......না হইতেও ত' পারে! হয়ত' এম্‌নি আরও দশ-বিশ খানা গ্রাম পার হইয়া সেখানে যাইতে হয়,—কলিকাতা হইতে তাহার দূরত্বের হয়ত' সীমা-পরিসীমা নাই!......তবে তাহার এইটুকুখানি ভরসা যে, নিখিল-দা সঙ্গে আসিয়াছে। অসিতার মনে হইল, সে-ও যদি এই সময় পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে তাহার সহিত গল্প করিতে করিতে চলিত... ..কিন্তু ট্রেণ হইতে নামিয়া কোথায় কোন্ দিকে একটা সোজা রাস্তা দিয়া বরযাত্রীদের সহিত সে চলিয়া গেছে! ......আচ্ছা এই সব মাঠের উপর গ্রামের ধারে প্রতিদিন রাত্রে শিয়ালের ডাক শুনিতে পাওয়া যায় না? কিন্তু কে-ই বা বলিয়া দিবে! পশ্চাতে যে লোকটি বসিয়া আছে, তাহাকে তো জিজ্ঞাসা করিতে পারে না!......জ্যৈষ্ঠের মধ্যাহ্নে, পাল্কীর দরজার ফাঁক দিয়া আগুনের হল্কার মত গরম বাতাস তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন পুড়াইয়া দিতেছিল। তাহার ইচ্ছা করিতেছিল, দরজাটা একটুখানি টানিয়া বন্ধ করিয়া দেয়, কিন্তু কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হইল,—বস্ত্রের আবরণের মধ্য হইতে হাত দুইটা বাহির করিতেও পারিল না। ষ্টেশন হইতে পাল্কী বেহারারা অনেকখানি পথ চলিয়া আসিয়াছে, এখনও তাহাদিগকে এই রৌদ্রতপ্ত পথের উপর দিয়া এত বড় একটা ভার স্কন্ধে লইয়া কতদূর চলিতে হইবে কে জানে! প্রথম পাল্কীটা কাঁধে তুলিয়াই তাহারা যেমন জোরে-জোরে

তাহাদের মুখস্থ বুলি আবৃত্তি করিতেছিল, মাথার উপর খর-রৌদ্র এবং পথশ্রান্তি বশতঃ এখন সে বেচারাদের গলার আওয়াজ একেবারে নিচের পর্দায় নামিয়া গিয়াছে,—পিপাসায় কণ্ঠ হয়ত তাহাদের শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছে! তাহাদের জন্য অসিতার বড় দয়া হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে, গরম বাতাস যখন অরুণের নিকটেও অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন সে ধীরে ধীরে হাত বাড়াইয়া পাল্কীর দরজা দুইটা নিজেই বন্ধ করিয়া দিল এবং অসাবধানতা বশতঃ কিংবা ইচ্ছা করিয়া জানি না, অসিতার একখানা হাত সে নিজের দিকে টানিয়া লইল। অসিতা শিহরিয়া উঠিল,—লজ্জায় ও ভয়ে সে যেন কাঠ হইয়া গেল। হাত-খানা সে একবার টানিয়া লইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু অরুণের দৃঢ় মুষ্টি সে শিথিল করিতে পারিল না। তেমনি ভাবে পিছন ফিরিয়া বসিয়া রহিল। লজ্জায় ও বিরক্তিতে অসিতার মুখখানা রাঙা হইয়া উঠিতেছিল।…এইবার অরুণ তাহার হাতখানা ছাড়িয়া দিল। অসিতা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। কিন্তু মিনিট দুই চুপ করিয়া থাকিবার পর, তাহার দুইহাত দিয়া জোর করিয়া অসিতার মুখখানা নিজের মুখের দিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিল। তাহার নির্লজ্জ ব্যবহার অসিতার আর সহ্য হইল না, সে-ও জোর করিয়া তাহার হাত দুইটা ছাড়াইয়া দিয়া বলিল, যাও! কিন্তু পাছে তাহার কথটা বাহিরে বেহারাদের কাণে প্রবেশ করে এই ভয়ে সে এত আস্তে কথাটা উচ্চারণ করিল যে অরুণও শুনিতে পাইল না।

ঝড়ো হাওয়া

ক্ষণে বিজলী চমক এবং মেঘ গর্জ্জনের সঙ্গে-সঙ্গে বর্ষণের আশঙ্কায় পথযাত্রী সকলেই অতিশয় ব্যস্ততার সহিত বাড়ীর দিকে ফিরিতেছিল। ঠিক এই দুর্য্যোগের মুহূর্ত্তে মাণিকতলার সেই বাড়ীটার সদর দরজায় এক যুবক ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। ধাক্কা মারিয়া দেখিল, ভিতর হইতে দরজাটা কে বন্ধ করিয়া দিয়াছে। ডাকিল, নিখিল! নিখিল! কিন্তু ভিতর হইতে কাহারও সাড়া পাইল না। দেখিতে দেখিতে জোরে বৃষ্টি নামিল। যুবকের সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া যাইতেছিল, দরজার উপরে আর একবার জোরে ধাক্কা দিয়া কহিল, নিখিল!—কে আছ, দরজা খুলে দাও। কিন্তু ঝড়ো হাওয়া এবং মেঘের গর্জ্জনে তাহার কণ্ঠস্বর কোথায় তলাইয়া গেল, বোধ করি ভিতর পর্য্যন্ত পৌঁছিল না।

গলির ভিতর কোথাও দাঁড়াইবার আশ্রয় নাই, অথচ বৃষ্টির ফোঁটা-গুলা তাহার গায়ের উপর সূচের মত বিঁধিতেছিল,—এমন করিয়া সে দাঁড়াইয়া ভিজিবে কতক্ষণ? বন্ধুর উপর তাহার রাগ হইতেছিল। চিঠি লিখিয়া নিখিল তাহাকে আসিতে বলিল, অথচ দরজায় খিল বন্ধ করিয়া সে নির্ভাবনায় উপরে বসিয়া আছে,—এরূপ অভদ্রোচিত আচরণ সে তাহার নিকট প্রত্যাশা করে নাই। মেঘের গর্জ্জন ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল, বৃষ্টি বন্ধ হইবার কোনও আশা ভরসা নাই! মেঘের অবস্থা দেখিবার জন্য সে একবার আকাশের দিকে তাকাইল; কিন্তু নিবিড় বারিধারায় মাথার উপরে সমস্তই যেন ধূসর হইয়া উঠিয়াছে,—সে পাণ্ডুরতা, বৃষ্টিধারার সে ছায়াময় অন্ধকারের আবরণ ভেদ করিয়া দৃষ্টি

কিছুক্ষণ পরে পাল্কী প্রায় গ্রামের নিকটে আসিয়া পৌছিল। বেহারাদের শুষ্ক কণ্ঠের স্তিমিতপ্রায় কণ্ঠস্বর আবার সপ্তমে চড়িয়া গেল। অসিতা তাহার সম্মুখে কাঁচের ভিতর দিয়া দেখিতে পাইল, একদল বালক-বালিকা তাহাদেরই দিকে ছুটিয়া আসিতেছে! বর-যাত্রীরা বোধ করি আগেই পৌছিয়া তাহাদের আগমনবার্ত্তা সমস্ত গ্রামে প্রচার করিয়া দিয়াছে।...দরজা বন্ধ দেখিয়া ছেলে-মেয়েগুলা পাল্কীর সঙ্গে ছুটিতে ছুটিতে চীৎকার করিতে লাগিল, নতুন বৌ, তোমার মুখ দেখ্‌ব, কবাট খোলো!

অসিতার ইচ্ছা করিতেছিল, সে ঝাঁপ দিয়া এখনই পল্কী হইতে নামিয়া পড়ে!

তাহাদের চীৎকার ক্রমেই উদ্দাম হইয়া উঠিতেছিল,--পাল্কী বেহারাদের দু'একজনের নিকট ধমক্ খাইয়াও তাহারা চুপ করিল না।

হঠাৎ অসিতা শুনিতে পাইল, তাহাদের পাল্কীর সঙ্গে ছুটিতে ছুটিতে কে একটা মেয়ে যেন আর একজনকে প্রশ্ন করিতেছে,—দরজা বন্ধ করে' ওরা কি কোরছে ভাই?......

অসিতার মুখখানা আবার রাঙা হইয়া উঠিল। সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পরিল না,—লজ্জা সরম পরিত্যাগ করিয়া তাড়াতাড়ি বাঁ হাত দিয়া দরজাটা খুলিতে যাইতেছিল, অরুণ তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া চুপি চুপি বলিল, যত সব দুষ্টু ছেলে মেয়ে......

এই সব ছেলে-মেয়ের নমুনা দেখিয়াই অসিতার একটুখানি ভয়

হইয়াছিল, না জানি বয়োজ্যেষ্ঠারা কেমন হইবেন !......তাই সে তাহার এই অপরিচিত স্থানের একমাত্র পরিচিত অরুণের দিকে এতক্ষণ পরে তাহার মুখ ফিরাইয়া চাহিল, কিন্তু অসিতার ওই দুটি সরম-চঞ্চল কালো-চোখের চাওয়ায় কত যে করুণ মিনতির বেদনা ফুটিয়া উঠিল, বোধ করি অরুণ তাহা লক্ষ্য করিয়াই নীরবে হাসিতে লাগিল।......

গ্রামের ভিতর, উমেশবাবুর বাড়ীর প্রায় কাছাকাছি একটা রাস্তার ধারে কালীমন্দিরে প্রণাম না করিয়া বর কন্যা ঘরে ঢুকিবে না, কাজেই কলিকাতার নূতন বৌ দেখিবার আশায় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা চণ্ডীমণ্ডপের আনাচে-কানাচে উদ্‌গ্রীব হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। পাল্কী নামাইয়া দিয়া বেহারারা একটুখানি সরিয়া দাঁড়াইতেই মেয়েরা ছুটিয়া আসিয়া পাল্কীর উপর প্রায় হুম্‌ড়ি খাইয়া পড়িল। একজন বৃদ্ধা,—বোধ হয় গ্রাম সম্পর্কে অরুণের ঠান্‌দিদি হইবেন, প্রথমেই পাল্কীর দুরজাটা খুলিয়া দিয়া একটু-খানি রহস্যের ছলে কহিলেন, দরজা বন্ধ করে' বৌকে কি কোলে বসিয়ে আন্‌চো ভাই ? কই দেখি, কেমন বৌ,—এসো তো ভাই নতুন বৌ ! বলিয়া অসিতার হাতে ধরিয়া তাহাকে পাল্কী হইতে বাহিরে আনিয়া সর্ব্বপ্রথমে তাহার ঘোম্‌টা খুলিয়া দিলেন এবং বেশ ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন, বেশ বৌ ! ও মা, এ যে বেশ ডাগর-ডোগর অরুণ !

অসিতা হেঁট্‌ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি আনন্দিত হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, জন্ম এয়োস্ত্রী হয়ে থাক ভাই, আর যে-রকম ভোগালো 'শরীল্‌'—চাঁদপানা বেটা-বেটির 'আশীব্বাদ' আর কোরতে

হবে না—সম্বচ্ছরের মধ্যে হবেই, সেকথা আমি এই মা-কালীর কাছে বলে' যাচ্ছি—তা দেখে নিও ভাই! বলিয়া ঈষৎ হাসিয়া তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, যাও মা, মন্দিরে একটি প্রণাম কর। তোমাকেও তো পাশাপাশি হাত ধরে' যেতে হয় ভাই অরুণ,—তুমিও যাও। মা কালীকে বল, সম্বচ্ছরের মধ্যে একটি বেটা হোক্,...

অন্যান্য সমবেত মেয়েদের মুখে-মুখে, চোখে-চোখে আস্তে এবং জোরে নূতন বৌ সম্বন্ধে অনেক মন্তব্যই প্রকাশিত হইতেছিল। বেশ বড় মেয়ে...বয়স বোধ করি বাইশ তেইশের বেশী হবে না...হিন্দু না ইয়ে...ইত্যাকার দু' একটা সমালোচনা অসিতার কাণে আসিয়া যে পৌঁছিল না, এমন নয়! অসিতা কোনদিকে দিক্‌পাত না করিয়া নতমুখে পুনরায় অরুণের পশ্চাৎ পাল্কীতে আসিয়া বসিল। ভবিষ্যতের যে-সব জল্পনা-কল্পনা এতক্ষণ ধরিয়া তাহার মনের মধ্যে উদয় হইতেছিল, হঠাৎ সে চিন্তার স্রোত যেন বন্ধ হইয়া গেল,—তাহার কল্পিত স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে-না-করিতেই তাহার মনে হইল, ইহারই মধ্যে সব যেন ধুইয়া মুছিয়া ফর্সা হইয়া গেছে,—এখন সে কোনরকমে বর্ত্তমানের গণ্ডী পার হইতে পারিলেই যেন বাঁচে!...

বাড়ীর দরজায় পাল্কী হইতে 'বর-কনে' নামানো হইল। সঙ্গে-সঙ্গে শঙ্খ এবং হুলুধ্বনি হইতে লাগিল। ত্রয়োদশ বর্ষীয়া অরুণের এক ভগিনী রাণী এবং তাহার কয়েকজন সহচরী নববধূকে বরণ করিয়া লইবার জন্য দরজায় দাঁড়াইয়া ছিল। রাণী সর্ব্বপ্রথমে উপহাস করিয়া

বলিল, স্থাখ্ ভাই, পাল্কীর ভেতরটা একবার খুঁজে স্থাখ্,—বৌএর জুতো জোড়াটা কোথাও লুকিয়ে রেখে এলো কি না! বলিয়া তাহারা কয়েকজন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সহচরীদের মধ্যে একজন তরুণী অসিতাকে চিম্‌টি কাটিল, আর একজন তাহার গাল দুইটা এত জোরে টিপিয়া দিল যে, যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াও অসিতা না পারিল হাসিতে, না পারিল কাঁদিতে।...

ইতিমধ্যে অরুণের মা—ক্ষীরোদাসুন্দরী ও উমেশবাবু পুত্র এবং পুত্রবধূকে কোলে করিয়া ঘরে লইয়া যাইবার জন্য পাল্কীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। অরুণ এতবড় ছেলে হইয়া পিতার কোলে চড়িতে কোন প্রকারেই রাজি হইল না। লজ্জায় হেঁট্‌মুখ হইয়া সে সর্ব্বাগ্রে তাড়াতাড়ি পলায়ন করিতেছিল, এমন সময় পিছন্ হইতে তাহার গায়ের চাদরে টান্ পড়িতেই অরুণ মুখ ফিরাইয়া তাকাইল এবং ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তেই বোধ করি জীবনে সে প্রথম উপলব্ধি করিল যে, সে আর একা নয়,—পশ্চাতে আর একজনার কাপড়ের খুঁটে গাঁট্‌ছড়ায় সে বাঁধা পড়িয়াছে!...কিন্তু ক্ষীরোদাসুন্দরী ছাড়িবার পাত্রী নহেন,—কুলাচারের ব্যতিক্রম ঘটিলে না জানি কখন্ কি অমঙ্গল হইবে ভাবিয়া, টানিয়া হিঁচড়াইয়া জোর করিয়া অসিতাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। অসিতা আজ নববধূ হইয়া আসিয়াছে, মুখ ফুটিয়া তাহার কিছুই বলিবার উপায় নাই; কিন্তু এইবার চীৎকার করিয়া তাহার কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছিল।

দুই-চার-পা অগ্রসর হইয়াই ক্ষীরোদাসুন্দরী ঘায়েল্ হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

পশ্চাৎ হইতে রাণী বলিয়া উঠিল, ওকে নামিয়েই দাও না মা, পাঁচ-ছেলের মাকে কি তুমি কোলে নিয়ে যেতে পার?

তাহার কথা শুনিয়া একজন মহিলা বলিলেন, বাঃ, সে কি কথা! যা চিরকাল চলে' আস্‌ছে······

চিরকাল চলুক আর না চলুক্, ক্ষীরোদাসুন্দরী পুত্রবধূকে আর বহন করিতে পারিলেন না,—কোল হইতে নামাইয়া দিলেন। অসিতা এ দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইল বটে, কিন্তু পার্শ্বে দাঁত-বাহির-করা দেওয়ালের গায়ে অসিতার বাঁ-হাতের একটুখানি ছড়িয়া গেল।

ঘরের মধ্যে গিয়া বর ও বধূকে যে সব আচার অনুষ্ঠান করিতে হয়, সে-সবের বন্দোবস্ত আগে হইতেই ঠিক করা হইয়াছিল। শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী এবং অন্যান্য বর্ষীয়সী রমণীরা যেমন-যেমন আদেশ করিতেছিলেন অসিতাও নীরবে তাহাই করিতে লাগিল। বেশ সুচারুরূপে এবং সযত্নে কাজগুলি সে করিতেছে দেখিয়া একজন ষোড়শী হাসিয়া বলিল, এ-সব কাজ তুমি জান দেখছি, তোমায় বিয়ে কি আর একবার হয়েছিল বৌ?...

অসিতা শিহরিয়া উঠিল এবং ঘোম্‌টার আড়ালে তাহার চোখ দুইটা ছল্‌-ছল্ করিতে লাগিল।

৯

নিজের কন্যার বিবাহের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া রাত্রি প্রায় দেড়টার সময় ইন্দ্রনাথ তাঁহার পার্ক ষ্ট্রীটের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। মোটর-খানা তাড়াতাড়ি বিদায় করিয়া দিয়া নিঃশব্দপদক্ষেপে অতি সাবধানে নিচের একটা ঘরের দরজায় গিয়া দাঁড়াইতেই একটা লোক ফট্ করিয়া আলোর সুইচ্‌টা টিপিয়া দিয়া বলিল, এলেন বাবু? আমি জেগেই আছি।

তুই চুপ্ কর মতিলাল, অত চেঁচাস্‌নে। বলিয়া ইন্দ্রনাথ ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, দরজা বন্ধ করে দে।

মাত্র চোখে দেখিয়া মতিলালের বয়স ঠিক অনুমান করিবার উপায় নাই। একটা নর-কঙ্কালকে শুধু চাম্‌ড়া দিয়া ঢাকিয়া দিলে যেমন দেখায়, মতিলালকেও ঠিক তেম্‌নি দেখাইত; কিন্তু মুখখানা তাহার একবার দেখিলে চিরজীবনেও কেহ ভুলিতে পারিত না। গায়ের রং বেশ ফর্সা, মুখের উপর একজোড়া বড়-বড় গোঁফ, সাধারণ মানুষের চেয়ে নাকখানা প্রায় দ্বিগুণ লম্বা, চোখ দুইটা গোলাকার এবং উজ্জ্বল, মাথার চুলগুলা ছোট করিয়া কাটা। বিবাহ সে বোধ করি জীবনে করে নাই,—যেখানে দুবেলা চারিটি খাইতে পায় সেইখানেই থাকিয়া যায়,—আশ্রয়হীন হইলে আবার নূতন আশ্রয়ের সন্ধানে যেখানে-সেখানে ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু

সম্প্রতি তাহার আশ্রয়হীন হইবার ভাবনা ঘুচিয়াছে,—ইন্দ্রনাথ পার্ক ষ্ট্রীটের বাড়ীতে উঠিয়া আসা অবধি মতিলাল সেখানে বেশ নিরাপদেই বাস করিতেছে। ভাত এবং মদ দুই-ই খাইতে পায়, থাকিবার জন্য একটা ঘরও মিলিয়া গেছে। ইন্দ্রনাথের গৃহিণী আস্‌মান, তাহাকে 'ভিখিরী বামুন' 'পথের কুকুর' ইত্যাদি বলিয়া মাঝে-মাঝে জ্বালাতন করে বটে, কিন্তু মতিলাল সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বলে, তুমি যা-ই বল আর তা-ই বল, আমি কিন্তু এইখানেই মাটি নেব।

দরজাটা বন্ধ করিতে করিতে মতিলাল বলিল, চেঁচাব না? গালাগালি যে আমাকেই খেতে হয়।

গরম কাপড়ের র‍্যাপারখানা মাথা হইতে খুলিয়া ইন্দ্রনাথ একটা চেয়ারের উপর বসিয়াছিলেন, হঠাৎ একটুখানি সন্ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, আস্‌মান কিছু বল্‌ছিল না কি মতিলাল?

মতিলাল তাঁহার নিকট অগ্রসর হইয়া চোখ মুখ ঘুরাইয়া বলিল, বাবাঃ! বলা বলে বলা! প্রথমে আমার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার হয়ে গেল, তার পর হলো আপনার—এখনও বোধ করি বসে' বসে' সে গর্জ্জাচ্ছে।

তুই কি বল্‌লি?

আমি স্পষ্ট কথা বলে দিয়েছি বাবু, তাতে আপনি রাগ করুন আর যাই করুন্। আমি বল্‌লুম, বাবু গেছেন মেয়ের বিয়ে দিতে—রাত্রে বোধ করি আস্‌বেন না।

ইন্দ্রনাথ রাগিয়া উঠিলেন; বলিলেন, এবার থেকে তোর কাছেও

আর কিছু বলা হবে না দেখ্ছি! তোর এটুকু বুদ্ধি হলো না হতভাগা, তুই কেন ওর কাছে ও সব কথা বল্তে গেলি?

মতিলাল বলিল, সে তো আজ বলে নয়,—আপনি চিরকাল জানেন বাবু, কেউ গাল-মন্দ দিলে আমার অত বুদ্ধিশুদ্ধি জোগায় না।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ইন্দ্রনাথ বলিলেন, আচ্ছা যাক্, সেই আধখানা কোথায় রেখেছিস্ নিয়ে আয়। দে বাপু দে শীগগির দে......

মতিলাল খুশী হইয়া বলিল, ঠিক বলেছেন বাবু, ও সব যানে দেও। বলিয়া বাঁদিকের একটা টেবিলের নিচে হইতে একটা মদের বোতল গ্লাস ও জল আনিয়া ইন্দ্রনাথের সম্মুখে টেবিলের উপর ধরিয়া দিল।

ইন্দ্রনাথ খানিকটা গলাধঃকরণ করিয়া বলিলেন' নে এবার তুই গেল্।

মতিলাল হাসিতে হাসিতে তাঁহার পাশের চেয়ারখানার উপর বসিয়া বলিল, আমিও কি এই এত রাত পর্য্যন্ত সাধ করে' জেগে বসেছিলাম বাবু, এইটুকুর জন্যে আমার আর ঘুম হয় নি!

ঢক্ ঢক্ করিয়া খানিকটা গিলিয়া মতিলাল আবার বলিল, আপনি আজ চলে এলেন কেন বাবু,—বিয়ে ঠিক হয়ে গেল, না তার আগেই চম্পট্ দিয়েছেন?

ইন্দ্রনাথ সে কথাটার কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, তাই ত রে

মতিলাল, তুই বেশ ভাল কাজ করিস্ নি! শেষ পর্য্যন্ত ওকে বলে'......

ভালো কাজ যে করিনি সে কথা তো প্রথম থেকেই বল্‌ছি বাবু, আমারও তাই ভয় হচ্ছে, যদি সে রাগ-টাগ্ করে' আবার কোথাও পালিয়ে যায়।...

দূর বোকা পালিয়ে যাবে কেন?

হ্যাঁ, তাও তো বটে, পালিয়েই বা যাবে কোথায়? সে কি আর কম ভালোবাসে আপনাকে। তবে কি না...এই ধরুন্, আপনাকে যদি আর সেখানে না যেতে দেয়।...

আরে, তুই তো জানিস্, আমিই বা কোন্ যাই সেখানে? ভুলেও একদিন তাদের নাম করেছি? তবে আজ না গেলে নয়, তাই যেতে হলো।

মতিলালের নেশা ধরিয়াছিল। সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, নিশ্চয়ই। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা,—কাকস্য পরিবেদনা। কে কাকে দেখে বলুন? ভগবান মালিক, খোদা! খোদা! বলিয়া মতিলাল একবার উপরে কড়িকাঠের দিকে হস্ত প্রসারিত করিল। পরে আবার বলিতে লাগিল, এই আপনার আস্‌মানের কথাই না হয় ধরুন্, তাকেও তো এই সেদিন পর্য্যন্ত দেখ্‌লুম, পথে দাঁড়িয়ে লোক ডাক্‌ছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ভগবান জুটিয়ে দিলেন, আপনার মতন কাপ্তেন্ জুটে গেল। ব্যস্! আর কি চাই, তোফা আরাম!

ইন্দ্রনাথ বলিলেন, গাধার মত চেঁচাচ্ছিস্ কেন? আস্তে কথা বল্‌তে পারিস্ না? এক্ষুনি শুন্‌তে পায় ত' তোর মদ খাওয়া বার কোর্‌বে। তা জানিস্?

তা জানি বাবু, আপনার সঙ্গে খেতে না দেয়, কাল থেকে ধেনো-মদই না হয় খাব। ধেনোই তো ছেলেবেলা থেকে অভ্যেস্, এই আপনার মত বাবুদের সঙ্গেই যা এক-আধটু বিলিতি খাই। আপনার আস্‌মান্‌কেই না হয় শুধিয়ে দেখ্‌বেন, বাজারের শস্তা মাল কি ও-ই কম খেয়েছে? বলিয়া মতিলাল হাসিতে লাগিল।

ইন্দ্রনাথ জড়িতস্বরে কহিলেন, পয়সা কোথায় পাবি?

আপনি দেবেন।

আস্‌মান যদি বলে, ও-পয়সা আমার, তুই নিতে পাবিনে। তখন?

তাহ'লে বলুন, আজকে যে সেই পাঁচশ-টাকার চেক্‌খানা আমায় দেখিয়ে নিয়ে গেলেন, সেও তার। আমিও কাল সব গোলমাল করে দেব কিন্তু।

ইন্দ্রবাবুর নেশা যেন একটুখানি চটিয়া গেল, বলিলেন, আরে চুপ্ চুপ্! খবরদার ও-কথা মুখে আনিস্ নে,—সর্ব্বনাশ কোরবে তাহ'লে।

সর্ব্বনাশের যে আর বেশী কিছু বাকী নাই, মাতাল হইলেও মতিলাল তাহা বুঝিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া সে কথা বলিতে পারিল না।

তাহার ততদূর পৌঁছিল না বরং সহসা একটা তীব্র বিদ্যুৎ চোখের সুমুখে চমকিয়া উঠিতেই সে শিহরিয়া উঠিল। আর দাঁড়াইয়া থাকা চলে না ভাবিয়া সে একবার শেষ চেষ্টা করিল। সজোরে কয়েকবার চীৎকার করিয়া সে প্রাণপণে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগিল। আর একটুখানি হইলেই পুরাতন দরজার কবাট দুইটা বোধ করি আপনা হইতেই ভাঙিয়া পড়িত ; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এতক্ষণে ভিতর হইতে খিল্ খোলার শব্দ হইল। দেখিল, ঝি আসিয়া খিল খুলিয়া দিয়াছে। দরজা বন্ধ করিয়া রাখার জন্য ঝি আপন মনে অন্য কাহার উপর দোষারোপ করিতেছিল। যুবক সে কথায় কর্ণপাত করিল না। তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া রাগে গস্ গস্ করিতে করিতে নিখিলের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল কিন্তু ঘরে তাহাকে দেখিতে না পাইয়া তাহার রাগ আরও বাড়িয়া গেল। পার্শ্বের বিছানায় এক ভদ্রলোক আপাদ মস্তক কাপড় ঢাকা দিয়া বাদলের দিনে আরাম করিতেছিলেন। সে জোরে-জোরে জিজ্ঞাসা করিল, বল্‌তে পারেন মশায়, নিখিল কোথায় ?

তিনি জাগিয়া ছিলেন, মুখের ঢাকা না খুলিয়াই কাপড়ের ভিতর হইতে উত্তর দিলেন, জানি না। বোধ হয় বেরিয়ে গেছেন।

আর কোন কথা না বলিয়াই সে যেমন ঢুকিয়াছিল তেম্‌নি বাহির হইয়া যাইতেছিল, কিন্তু পরক্ষণেই ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিল, তাহা হইলে নিখিল ত জানিবে না যে সে আসিয়াছিল। তাহাকে জানাইয়া যাওয়া চাই। সর্ব্বাঙ্গ দিয়া তাহার জল গড়াইতেছিল, একবার বাহিরে

বলিল, রাম বল! সে কথা আমি কেন বোল্‌তে যাব বাবু? বরং বল্‌ব, সেই সেদিন, সে-ই আপনার ভাই যেদিন এসেছিল, সেদিন সে আপনাকে পাঁচশ টাকা দিয়ে গেছে। কি বলুন?

না রে না, তোকে কিচ্ছু বল্‌তে হবে না বাপু, তুই চুপ করে' থাকিস্‌।

বেশ, তবে বেশ, তাই চুপ করেই থাক্‌বো। ভালোতেও না মন্দতেও না।

কই, ঢাল্‌ দেখি আর একটুকু। বলিয়া ইন্দ্রনাথ টেবিলের উপর গ্লাসটা সরাইয়া দিলেন।

মতিলাল বোতলটা একবার আলোর সুমুখে তুলিয়া ধরিয়া কতখানা আছে তাহাই দেখিয়া লইল, পরে ধীরে-ধীরে গ্লাসের উপর খানিকটা ঢালিয়া দিয়া বলিল, আপনার পিপাসা তো খুবই পেয়েছিল, সেই জন্যেই বোধ করি বিয়ে না হতেই পালিয়ে এলেন? সেখান পর্য্যন্ত পৌছে-ছিলেন ত?

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া ইন্দ্রনাথ গ্লাসটা মুখে ঢালিয়া দিলেন। এবং পরক্ষণেই রুমালে মুখটা মুছিতে মুছিতে সভয়ে প্রশ্ন করিলেন, একবার উঠে' ছাখ্‌ দেখি মতিলাল, মনে হলো, কে যেন ডাক্‌ছে! চুপ্‌। শুন্‌তে পাচ্ছিস্‌?

মতিলালও একটুখানি চমকিত হইয়া দরজার দিকে কিয়ৎক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া রহিল, কিন্তু কোথাও কোন শব্দ না পাইয়া বলিল, মিছে-

মিছি নেশাটা চটিয়ে দিলেন বাবু, কোথাও কেউ নেই, আর আপনি বললেন, ডাক্‌ছে!

ইন্দ্রনাথ বলিলেন, নে বাপু নে, চট্‌পট্‌ শেষ করে' দে ওটা। আমি উঠ্‌ব এবার।

বোতলটা শেষ করিবার জন্য অবশিষ্ট মদটুকু মতিলাল গ্লাসের উপর ঢালিতেছিল, এমন সময় তাহাদের বন্ধ দরজার গায়ে শব্দ হইতেই উভয়েই যুগপৎ চমকিয়া উঠিল।

তাহারা স্পষ্ট শুনিতে পাইল, আস্‌মান্ জিজ্ঞাসা করিতেছে, মতে! মতে! বাবু এসেছে?

ইন্দ্রনাথের বুকের ভিতরটা ধক্ করিয়া উঠিল। মতিলালের কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপি চুপি বলিলেন, বলে দে, না আসেনি।

মতিলাল চীৎকার করিয়া বলিয়া দিল, আমি জানি না। তাহার পর দরজার নিকট উঠিয়া গিয়া কবাটে কাণ পাতিয়া যখন শুনিল, আস্‌মানের পদধ্বনি পুনরায় সিঁড়ির উপরে উঠিয়া গেল, তখন নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, চলে' গেছে।

ইন্দ্রনাথ দাঁত খিঁচাইয়া বলিলেন, আমি বলুলুম, হারামজাদা তখন হেসে উড়িয়ে দিলে!

মতিলাল বলিল, কিন্তু বাবু, আপনার খাই, পরি,—আপনি যাই বলেন তাই বলেন, তাই বলে' উনিও কি আমায় 'মতে' বলে' ডাক্‌বেন

না কি ? আপনি বারণ করে' দেবেন বাবু,—আমি বামুনের ছেলে। আমার বাবার নাম পীতেম্ গাঙ্গুলী।

আমার তো একার নয়, ওরও তো খা'স্। এ বাড়ীও তো ওকে লিখে দিয়েছি।

মতিলাল এইবার হেঁটমুখে টেবিলের উপর মাথা গুঁজিয়া চুপ করিয়া রহিল। নেশার ঝোঁকে এরূপ করিতেছে ভাবিয়া ইন্দ্রনাথ প্রশ্ন করিলেন, নেশা কি খুব বেশী হয়েছে মতি ? ও কি কর্‌চিস্ ?

পেন্নাম করছি বাবু।

কাকে রে ?

আপনার বিবিকে।

১০

অসিতার শ্বশুরবাড়ী হইতে তাহাকে লইয়া নিখিল ফিরিয়া আসিয়াছে। অরুণও সঙ্গে আসিয়াছিল। সপ্তাহখানেক ইটিলিতে কাটাইয়া দিন চার পূর্ব্বে সে তাহার নিজের হোষ্টেলে চলিয়া গেছে। —

গত কয়েকদিন হইতেই চন্দ্রনাথের শরীরটা বেশ ভাল ছিল না, তাহা সত্ত্বেও সে প্রত্যহ অফিস যাইতেছিল। অসুস্থ শরীরে পরিশ্রম করার জন্যই হোক্, কিংবা অনিয়ম অত্যাচারের জন্যই হোক্ হঠাৎ সেদিন তাহার জ্বর অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। সে আর অফিস যাইতে পারিল না। অফিস হইতে নিখিল আর সেদিন তাহার মাণিকতলার মেসে না ফিরিয়া বরাবর ইটিলি গিয়া উপস্থিত হইল। চন্দ্রনাথের জ্বর অত্যন্ত বেশী। একে ত' উদ্বক্তা মানুষ, তাহার উপর জ্বর হইয়াছে, কাজে কাজেই জ্বরের ঘোরে সে বড় বেশী চীৎকার করিতেছিল। অসিতা, সুচিত্রা দু'জনেই ভাবিয়া আকুল হইয়া পড়িয়াছে,—কি করিয়া যে কি হইবে কে জানে! এমন সময় নিখিলকে আসিতে দেখিয়া তাহারা যেন একটুখানি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। গত রাত্রি হইতে কাকাবাবুর অসুখ বাড়িয়াছিল বলিয়া সুচিত্রা ও অসিতা দুজনেই সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তাঁহার শিয়রে বসিয়া বিনিদ্র রাত্রি যাপন করিয়াছে, আজিও সমস্তটা দিন তাহারা একটুখানি বিশ্রাম করিয়াছে কি না

সন্দেহ! অসিতা তাহাদের দুজনের মত দিনের বেলা চারটি রান্না করিয়াছিল, কোনরকমে তাহাই নাকে-মুখে গুঁজিয়া আবার তাহারা রোগীর শয্যায় আসিয়া বসিয়াছে!

নিখিল ব্যাপারটা আন্দাজি বুঝিয়াছিল। ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সুচিত্রা শিয়রের নিকট বসিয়া চন্দ্রনাথের মাথার চুলে ধীরে-ধীরে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতেছে আর অসিতা শয্যার অপর প্রান্তে বসিয়া তাহার পায়ে হাত বুলাইতেছে। ভয়ে ভাবনায় দুজনের মুখ দুইটি একেবারে শুকাইয়া গেছে এবং রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি সে মুখের উপর বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে!...

নিখিলকে দেখিয়াই অসিতা বলিয়া উঠিল, এই যে! এসো ত' নিখিলদা! কাকাবাবুর ভারি জ্বর—

সুচিত্রা কোন কথাই বলিল না, সে যেমন বসিয়া ছিল তেমনি নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

নিখিল চন্দ্রনাথের গায়ে মাথায় হাত দিয়া দেখিল। সমস্ত রাত্রি-দিন চীৎকার করিয়া এতক্ষণে ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া সে একটুখানি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। পাছে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হয় এই ভাবনায় অতি অন্তর্পণে সুচিত্রা ও অসিতাকে বাহিরে যাইবার ইঙ্গিত করিয়া নিখিল নিজেও বাহির হইয়া আসিল।

সুচিত্রার মুখের পানে তাকাইয়া নিখিল বলিল, জ্বর কি খুব বেশী বলে' মনে হচ্ছে? একদিনেই যে তোমরা ভেবে অস্থির হয়েছ দেখ্ছি।

অসিতা বলিল, ভাবনা হয় না নিখিলদা? কাল রাত্রে যদি একবার থাকতে তো দেখতে মজা! আবোল্-তাবোল্ কি যে বল্‌ছিলেন ..

জ্বর একটু বেশী হলেই ও-সব হয়—ভাবিস্ নে। তোদের এখন আর ওখানে যেয়ে কাজ নেই, উনি একটু নিশ্চিন্তে ঘুমোন্।

সুচিত্রা এইবার ধীরে-ধীরে বলিল, একজন ডাক্তার ডাক্‌লে ভাল হতো।

অসিতার মুখের পানে তাকাইয়া নিখিল বলিল, ডাক্তার তো ঘরেই ছিল, ছেড়ে' না দিলেই তো হতো!

সে যে কোন্ ডাক্তারের কথা বলিতেছে সুচিত্রা এবং অসিতা দুজনেই বুঝিল। সুচিত্রা ঈষৎ হাসিল। অসিতা বলিল, আমার সঙ্গে তোমার কি আছে বলত? সব সময়েই তোমার··· ·ভাল লাগে না —যাও!

আচ্ছা বেশ, আমি না হয় অন্য ডাক্তারই ডেকে' আনছি, কিন্তু— বলিয়া নিখিল আর একবার অসিতার দিকে তাকাইয়া বলিল, তুই বাপু ঘুমোগে যা। রাত জেগে চোখদুটো তোর ছানাবড়ার মতন লাল হয়ে উঠেছে,—শেষে তোর জন্যে নতুন ডাক্তার না ডাক্‌তে হয়। বলিয়া তাহাকে আর কোন কথা বলিবার সুযোগ না দিয়াই নিখিল বাহির হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরেই নিখিল একজন বৃদ্ধ ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া

আসিল। তিনি একটা ঔষধের 'প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন্' লিখিয়া দিয়া বলিয়া গেলেন, জ্বর একটু বেশী হয়েছে, তার জন্যে ভাব্‌বার কিছু নেই। তবে আজ রাত্রি জেগে ওষুধটা খাওয়াতে হবে।

নিখিল যখন ঔষধ লইয়া ফিরিল তখন সন্ধ্যা হইয়া গেছে। ডাক্তার আসার পর হইতে চন্দ্রনাথ জাগিয়াই ছিল। এক দাগ ঔষধ তাহাকে খাওয়াইয়া দিয়া নিখিল তাহার শয্যার পার্শ্বে বসিতেই চন্দ্রনাথ বলিল, সামন্ত সাহেবকে বলো, আমার জ্বর হয়েছে,—ডাক্তার আবার কি জন্যে আন্‌তে গেলে নিখিল? আমার জ্বর দুদিনেই সেরে যাবে।—সুচিত্রা! কোথায় গেল সুচিত্রা?

অসিতা কাছেই বসিয়াছিল। বলিল, দিদিকে ডাক্‌ব কাকবাবু? সে চা তৈরী কোরতে গেছে।

চন্দ্রনাথ বলিল, না, আর ডাক্‌তে হবে না। তোরা কাল সমস্তটা রাত জেগেছিস্ মা, বড় কষ্ট হয়েছে, নয়?

অসিতা বলিল, না, কষ্ট কেন হবে?

এমন সময় সুচিত্রা ডাকিল, অসিতা!

অসিতা উঠিয়া গেল।

চন্দ্রনাথ তাহার জ্বরতপ্ত হাতখানা প্রসারিত করিয়া নিখিলের একখানা হাত ধীরে-ধীরে চাপিয়া ধরিল। তাহার মুখের পানে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া বেদনা-বিকৃত কণ্ঠে কহিল, আমি যদি মরে' যাই নিখিল? কি হবে?

নিখিল বলিল, আপনি আর কথা বস্‌বেন না কাকাবাবু, চুপ—করে' একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন, আপনার জ্বরের ঘোর এখনও কাটেনি।

চন্দ্রনাথ নিখিলের হাতখানা আর একটু জোরে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, না বাবা, মিছে কথা নয় নিখিল, জ্বর জ্বালা হলে সেই ভাবনা-টাই আমার আগে হয়।—আজ দুপুরে আমি চোখ বুজে পড়েছিলুম বটে কিন্তু ঘুম আমার হয়নি। সুচিত্রা অসিতা বলাবলি করছিল, ঘরে একটা বেটা ছেলে নেই, কে-ই বা ডাক্তার ডাকে আর কে-ই বা কি করে—

নিখিল বলিল, আপনি ইচ্ছে করে' ঘুমোবেন না দেখ্‌ছি কাকাবাবু!······

ঘুমোচ্ছি বাবা, আমায় বল্‌তে দাও আগে।—আচ্ছা নিখিল, মানুষ যত পায়, ততই চায়—নয়?

নিখিল রাগ করিয়া বলিল, আমি জানি না।

রাগ করো না নিখিল। আমার স্বার্থের জন্যে তোমায় আজ একটা অনুরোধ কোরব, রাখ্‌তে হবে।

কি, বলুন।

চন্দ্রনাথ তাহার হাতখানা আবার চাপিয়া ধরিল। বলিল, মেসে আর তোমার থাকা চল্‌বে না নিখিল, আমাদের জন্যে তোমাকে এই-খানেই থাকৃতে হবে। আমাদের জন্যে তোমাকে অনেক কষ্ট—

নিখিল বলিল, এত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথাটা বল্‌বার তো কোন দরকার ছিল না কাকাবাবু,—তা আমি জানি। বলিয়া সে দেওয়ালের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল।

চন্দ্রনাথ কি যেন বলিতে যাইতেছিল কিন্তু কথাটা তাহার গলায় আট্‌কাইয়া গেল। পাশ ফিরিয়া সে নিখিলের দিকে বারকতক চাহিতেই তাহার চোখ দুইটা কানায় কানায় ভরিয়া উঠিল,—কয়েকবার ঢোঁক্ গিলিয়া তাহা প্রাণপণে রোধ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। নিখিলের হাতখানা নিজের মুখের উপর চাপিয়া ধরিয়া চন্দ্রনাথ থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

নিখিল মুখ ফিরাইয়া বলিল, ছি ছি কাকাবাবু, জ্বর আপনি এম্‌নি করেই বাড়িয়ে তুল্‌বেন। আপনার দুটি পায়ে পড়ি, আপনি চুপ করুন।

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে অসিতা বলিল, চা খাবে এসো নিখিলদা, আমি যাচ্ছি কাকাবাবুর কাছে।

নিখিলের হাতখানা ছাড়িয়া দিয়া চন্দ্রনাথ বলিল, যাও।

সুচিত্রা মেঝের উপর হেঁটমুখে বসিয়া চামচ দিয়া চায়ের পেয়ালাটা নাড়িতেছিল। নিখিল দরজার বাহিরে জুতা খুলিয়া তাহার নিকট গিয়া দাঁড়াইল। বলিল, এসময় আবার চা কেন সুচিত্রা?—এ কি, এত হালুয়া কে খাবে?

আসনটা পাতিয়া দিয়া সুচিত্রা বলিল, তুমিই খাবে। বেলা নটার

সময় তোমার মেসের ঠাকুর যা খাইয়াছেন তা ত জানি, তার পর অফিস থেকে এই খানেই এসেছ,—খাবে না কেন শুনি ?

আচ্ছা দাও। বলিয়া নিখিল আসনের উপর চাপিয়া বসিল।

হালুয়া এবং চা ধরিয়া দিয়া সুচিত্রা বাহির হইয়া যাইতেছিল, নিখিল বলিল, পালিয়ে যাচ্ছ যে ?

পালাবার কি পথ আছে ছাই ? আস্‌ছি। বলিয়া সুচিত্রা বাহির হইয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, খাচ্ছ না যে ? সব খেতে হবে কিন্তু।

সে কথার কোন জবাব না দিয়া নিখিল বলিল, কাকাবাবুর অসুখ দেখে তোমরা খুব ভয় পেয়েছিলে, নয় ?

সুচিত্রা বলিল, মোটেই না। ভয় আমি আর দুনিয়ায় কাউকে করি না।

বটে ? এত সাহস ? আচ্ছা, যদি আমি না আস্‌তুম আর ডাক্তার ডাক্‌তে হতো, কি কর্‌তে ?

দরকার হলে নিজেই যেতুম।

পারতে ?

যে কাজ না করলে উপায় নেই, অনেক সময় তাও করতে হয় বই কি !

তাও ভালো। বলিয়া নিখিল চায়ের বাটিটা তুলিয়া ধরিল।

আসিয়া কাপড়, জামা বেশ করিয়া নিংড়াইয়া লইয়া সে পুনরায় ঘরে প্রবেশ করিল। তাড়াতাড়ি একখানা খাতার পাতা ছিঁড়িয়া লইয়া ভাবিল, বেশ কয়েকটা কড়া কথা তাহাকে লিখিয়া দিয়া যাইবে। পকেট হইতে পেন্ বাহির করিয়া সে লিখিতে বসিল। প্রথমেই লিখিল ভাই লিখিল,—। কিন্তু না, ভাই লিখিলে ত' চলিবে না, কাজেই 'ভাই' কথাটা কাটিয়া দিল, অনেক ভাবিয়া অবশেষে লিখিল,—

—নিখিল, তুমি লিখিয়াছিলে বলিয়াই আসিয়াছিলাম।

ইতি—অরুণ।

কাগজের টুক্‌রাখানা বিছানার উপর ফেলিয়া অরুণ একবার বাহিরের পানে তাকাইয়া দেখিল, বৃষ্টি তখনও ধরে নাই। না ধরুক্,—সে চলিয়া যাইবে ; এখানে আর একদণ্ড অপেক্ষা করিতে পারিবে না।

গট্ গট্ করিয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া অরুণ সিঁড়ি ধরিয়া নিচে নামিতে লাগিল। অন্ধকার সিঁড়ির উপর জুতার শব্দে তাহার মনে হইল, নিচে হইতে কে যেন আর একজন উপরে উঠিতেছে। যে ব্যক্তি উঠিতেছিল, সে প্রশ্ন করিল, কে ?

নিখিলের গলার আওয়াজ টের পাইয়া অরুণের অভিমান হইল—বাবু বুঝি এতক্ষণে ফিরিতেছেন। সাড়া না দিয়া অরুণ পাশ কাটাইয়া নামিয়া যাইতেছিল কিন্তু এই আব্‌ছা অন্ধকারের মধ্যেও নিখিল তাহাকে চিনিতে পারিল। খপ্ করিয়া তাহার জামার পশ্চাতে টানিয়া ধরিয়া বলিল, ইস্! রাগ করে পালিয়ে যাওয়া হচ্ছে বুঝি ?—আয়।

দু'এক চুমুক খাইয়া বলিল, কাল তো সারারাত জেগেছ? ঘুম পায় নি?

সুচিত্রা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, একটা রাত জাগ্‌লে মেয়েদের ঘুম পায় না কি? এ কথা আজ তোমার কাছে নূতন শুন্‌লুম।

নিখিল তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, তাহ'লে তুমি কি বল্‌তে চাও মেয়েরা সর্ব্বংসহা?

কতকটা তাই। বলিয়া সুচিত্রা হাসিল। কিন্তু সেই হাসির পশ্চাতে কোথায় যেন একটা প্রচ্ছন্ন বেদনা লুকাইয়াছিল,--কথাটা বলিবার পর মুহূর্ত্তেই দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে তাহা যেন বাহির হইয়া আসিল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নিখিল বলিল, আজ আর তোমাদের রাত জাগ্‌তে হবে না,—আজ আমি জাগব।

খুব হয়েছে। অফিসের কেরাণীর অত বাহাদুরীতে কাজ নেই। সাহেব তোমার জন্যে অপিসে বিছানা পেতে রাখ্‌বে না।

নিখিল বলিল, কাল থেকে তোমাদের এইখানেই অতিথি হব,—মেসে আর থাকব না। তোমাদের কোন আপত্তি আছে?

সুচিত্রা হাসিয়া বলিল, হঠাৎ এ দুর্ম্মতি হবার কারণ?

কাকাবাবু এতক্ষণ সেই কথাই বলছিলেন,—তিনি কিছুতেই ছাড়বেন না, আর আমিও দেখ্‌ছি তা ছাড়া উপায় নেই।

সুচিত্রা মুখে কিছুই বলিল না বটে, কিন্তু আনন্দে তাহার চোখ-দুইটা নিমেষেই চঞ্চল হইয়া উঠিল।

২১

ইহাদের এই দুস্থ পরিবারের মাথার উপর চন্দ্রনাথের অসুখ, বৈশাখী মেঘের মত যত জোরে গর্জ্জিয়া উঠিয়াছিল, তত জোরে বর্ষিল না !···চলাফেরা করিতে না পারিলেও, পনর কুড়ি দিনের মধ্যেই চন্দ্রনাথ সারিয়া উঠিল।

নিখিলও তাহার মাণিকতলার মেস ছাড়িয়া দিয়া ইটিলিতে আসিয়া বাস করিতেছিল।

অরুণ তাহার হোষ্টেল হইতে পলায়ন করিয়া প্রায় প্রতি শনিবারেই ইটিলিতে আসিয়া হাজির হইত, আবার সোমবার দিন চলিয়া যাইত।

সেদিন শনিবার রাত্রি হইতে অসিতার সহিত অরুণের বচসা চলিতেছিল, রবিবার সকাল পর্য্যন্ত তাহার জের মিটিল না।

অসিতা চুপ করিয়া বসিয়াছিল, অরুণ বলিল, কথাও কইবে না না কি ? ওর উপর এত দরদ কিসের ?

গত রাত্রে ঝগড়া এবং তিরস্কার করিয়া অরুণ সত্য সত্যই অসিতাকে রাগাইয়া দিয়াছিল,—অসিতা তেম্‌নি মুখ ফিরাইয়া উত্তর দিল, আমি জানি না।

অরুণ তাহার কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, ত্যাখ, নিখিল কে

কোথাকার কে, তার ঠিক নেই,—তাই বল্‌ছিলুম, তার সঙ্গে একটু সাবধানে মেলা মেশা দরকার।

অসিতা বলিল, আমিও বল্‌চি. নিখিল-দাকে তুমি অত ছোট ভেবো না।

অসিতার কথাটাকে অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দিয়া অরুণ বলিল, ইস্! এ যে আমার চেয়েও তাকে বেশী ভক্তি দেখ্‌ছি,—এত ভক্তি রাখ্‌বে কোথায়?

অসিতা চুপ করিয়া রহিল, কোন কথা বলিল না।

অরুণ আবার বলিতে লাগিল, সব সময়েই মেয়েদের সাবধান থাকা উচিত, জান? সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে মিশ্‌লে অনেক সময় পুরুষদের দায়িত্ব-জ্ঞান থাকে না।

এইবার অসিতা কথা কহিল। বলিল, তোমার মত পুরুষদের না থাক্‌তে পারে, কিন্তু নিখিল দার সে জ্ঞানটুকু আছে।

অবশেষে নিজেই আক্রান্ত হইয়া অরুণ রাগিয়া উঠিল, কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, শোন অসিতা, আমি তোমায় বল্‌ছি,—আজ থেকে তুমি নিখিলের সঙ্গে কথা কইতে পাবে না।

বাঃ! আজ যদি আমার একজন ভাই থাক্‌তো, যদি নিজের একজন অম্‌নি দাদা থাক্‌তো, তাহ’লে তুমি বারণ করতে পারতে? এ কি অন্যায় আবদার তোমার?

হ্যাঁ, আবদার বই কি? তোমাদের—এই কল্‌কাতার সৌখিন মেয়েদের আমি ভাল রকম চিনি। তাদের—

তাহাকে কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই অসিতা স্পর্দ্ধার সহিত বলিয়া উঠিল, চেন? ছাই চেন। কজনকে তুমি দেখেছ?

অরুণ বলিল, অনেক দেখেছি। কলকাতার রাস্তায় যারা সব দাঁড়িয়ে থাকে, সে সব ত তোমরাই।

অসিতা যেন নিমেষেই দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তাহার শিক্ষিত স্বামীর মুখ দিয়া যে এ কথা বাহির হইতে পারে, সে তাহা ভাবে নাই, তবে, এই মাসখানেকের মধ্যে তাহার চিত্তের দৌর্ব্বল্য এবং সঙ্কীর্ণতাটুকু তাহার নিকট বেশ ধরা পড়িয়াছিল। অসিতা নিজেকে আর সাম্‌লাইতে না পারিয়া বেশ জোরে জোরেই বলিয়া ফেলিল, সে সব আমরা নই—তোমাদেরই পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা। যাদের শিক্ষা নাই, সংস্কার নেই। আর সে কীর্ত্তি করেছ তোমরাই। বলিতে বলিতে ক্রোধে এবং উষ্মায় অসিতার সমস্ত মুখখানা লাল হইয়া উঠিল।

অরুণ বলিল, তাহ'লে কি বল্‌ছ, নিখিলের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা ইয়ারকি কোরতে তুমি ছাড়বে না?

অসিতা একবার অরুণের মুখের পানে তাকাইয়া কহিল, তার সঙ্গে কথা কইতেই দেবে না?

দৃঢ়কণ্ঠে অরুণ বলিল, না, দেব না।

তোমার দুটি পায়ে ধরি, ওগো, তুমি আর যা-খুশী বল সব

শুন্‌বো,—কিন্তু···বলিয়া অসিতা তাহার পায়ের নিকট উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

অরুণ বলিল, আমি তোমার ভালর জন্যেই বল্‌ছি অসিতা। নিখিলকে আমার চেয়ে তো আর কাউ বেশী চেনে না। এখন আরও বেশ ভালো করেই বুঝ্‌তে পারচি, দেশের লোকের সঙ্গে সে কেন যেচে ভাব করে' বেড়ায়।

বাহিরে সুচিত্রার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাওয়া গেল। অসিতা তাড়াতাড়ি উঠিয়া চোখ দুইটা ভাল করিয়া মুছিয়া লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল, অরুণ তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, যাচ্ছ যে? আমার কথাগুলো শুন্‌লে?

ছাড়, দিদি আস্‌ছে। বলিয়া অসিতা দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। দেখিল, ঝিএর সহিত সুচিত্রা কথা বলিতেছে।

অসিতা ধীরে ধীরে দিদির ঘরে প্রবেশ করিতেই, ঝিকে নিচে পাঠাইয়া দিয়া সুচিত্রা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, কি হচ্ছিল রে তোদের? চেঁচাচ্ছিলি কেন?

অসিতা কোন কথাই বলিতে পারিল না। সমস্ত গোপন করিয়া কহিল, কিচ্ছু হয়নি ত? আমি একটুখানি চা খাব দিদি, ষ্টোভটা জ্বালাই। বলিয়া অসিতা ষ্টোভ লইয়া বসিল।

সুচিত্রা বলিল, বল্‌বি নে, নয়? আচ্ছা, আমি অরুণকেই জিজ্ঞেস করি। বলিয়া সে অরুণের উদ্দেশে বাহির হইয়া গেল।

অরুণ বিছানার উপর হাত-পা ছড়াইয়া শুইয়া ছিল, সুচিত্রাকে দেখিয়াই উঠিয়া বসিল।

সুচিত্রা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের ঝগড়া শুনে' আমি নিচের রান্নাঘর থেকে ছুটে আস্‌ছি ভাই! এত গোলমাল হচ্ছিল কেন, শুনি?

আপনি কি বোনের দিক হয়ে বিচার করতে এলেন? বলিয়া অরুণ হাসিতে লাগিল।

বিচার করতে আসিনি ভাই,—বোন ছেলে মানুষ, তাই দোষ ত্রুটি হয়ে থাকে, তার হয়ে ক্ষমা চাইতে এলুম।

হয়নি কিচ্ছু, তবে এই নিখিলের কথা হচ্ছিল। তাই নিয়ে সে ত একেবারে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে আমায় নাস্তা-নাবুদ্ করে' দিলে।

সুচিত্রা কোন প্রশ্ন না করিয়া বিবর্ণ মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

অরুণ আবার বলিল, বল্‌ছিলুম, নিখিল আমার বন্ধু হলে' কি হবে,—জীবনে তার কোন কিছু স্থিরতা নেই। আপনিই বলুন না, সে-সব লোক একটুখানি dangerous (ভয়ানক) হয় কি না!—আমার বিশ্বাস তারা সবই কোরতে পারে।

সুচিত্রা কোন মন্তব্যই প্রকাশ করিল না। শুষ্ক হাসি হাসিয়া অরুণের মুখের পানে একবার তাকাইল।

অরুণ বলিল, আমি তো ছেলেবেলা থেকেই তাকে চিনি। ঝড়ো হাওয়ার মত কেমন যেন উড়ো-উড়ো ভাব,—যেখানে-সেখানে

ঘুরে' বেড়ায়, যার-তার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে,—আর, এই মেয়েদের সঙ্গে—

বাহিরে বারান্দার উপর কাহার পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। অরুণ মুখ তুলিয়া দেখিল, নিখিল আসিতেছে। তাহাকে দেখিয়াই অরুণ তাহার কথার খেই হারাইয়া ফেলিল এবং কথার স্রোত তাড়াতাড়ি অন্যদিকে ফিরাইয়া লইবার জন্য সুচিত্রাকে হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিল, আপনাদের টেবিলের এই আর্শীখানা তো বেশ!

সুচিত্রা অরুণকে এত ভাল করিয়া চিনিতে পারে নাই। ব্যাপার দেখিয়া আজ সে স্তব্ধ নির্ব্বাক হইয়া নিশ্চল মূর্ত্তির মতই দাঁড়াইয়া রহিল।

নিখিল ঘরে ঢুকিয়া প্রথমেই সুচিত্রার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, ঝি বুঝি উনোন থেকে তোমার তরকারি নামিয়ে দেবে? এখানে বেশ গল্পে মেতে উঠেছ, আর ওদিকে রান্নাঘরে সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

ওমা, তাই ত! বলিয়া সুচিত্রা চলিয়া গেল।

অরুণ হাসিতে হাসিতে নিখিলকে জিজ্ঞাসা করিল, আজ বায়স্কোপে যাবি নিখিল?

না।

১২

মধ্যরাত্রে অসিতার সহিত অরুণের আবার ঝগড়া বাধিল।

অসিতার মন আজ সমস্ত দিন ভাল ছিল না। সকালবেলায় উভয়ের মধ্যে যে মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল, তাহারই সূত্র ধরিয়া আজ অসিতার মনে অনেক প্রশ্নই উদয় হইয়াছে! দুদিনের জন্য প্রথম স্বামী গৃহে গিয়া যে বিরুদ্ধ সমাজের শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহার সে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছে এবং অশিক্ষিতা কুসংস্কারাচ্ছন্ন রমণীদের সহিত সংগ্রাম সংঘর্ষে মনে-মনে সে যেরূপ ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে,—তাহা সে আজিও ভুলিতে পারে নাই। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আবহাওয়ায় বিপরীত মনোভাব লইয়া তাহাকে যে সেইখানেই তাহার ভবিষ্যতের সংসার গড়িয়া লইতে হইবে, সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত এবং বিপর্য্যস্ত হইয়াও যে তাহার ক্ষুদ্র তরীখানি উজানের মুখে বাহিয়া চলিতে হইবে, তাহা সে জানিত, কিন্তু তাহার মধ্যেও একটা মস্ত বড় আশা এবং আশ্বাসের স্থল ছিল অরুণ! সে যেন এতক্ষণ ধরিয়া তাহার চোখের সুমুখে ধ্রুবতারার মতই জ্বলিতে-ছিল। এমন অকস্মাৎ সে যে নিজেই নিজেকে নিষ্প্রভ করিয়া দিতে পারে, তাহা সে ভাবে নাই! এই সব খুঁটি নাটি তর্ক-বিতর্কের মধ্যে অরুণ যতই তাহার নিষ্ঠুরতা, দৌর্ব্বল্য এবং সঙ্কীর্ণতাকে ফুটাইয়া তুলিতে-ছিল, অসিতার রাগ এবং দুঃখ ততই বাড়িয়া চলিতেছিল। স্বামীকে

অশ্রেদ্ধয়, হীন সে কোন দিনই ভাবিতে শিখে নাই, ভগবান করুন, সে কথা ভুলিয়াও যেন তাহাকে কোন দিন ভাবিতে না হয়, তথাপি অসিতার মনে হইতেছিল, যাহাকে সে তাহার সর্ব্বস্ব দিয়া ভাল-বাসিতে চলিয়াছে, যাহাকে অবলম্বন করিয়া সে মহীয়সী হইবে, —আজ এই সম্ভাবনার মুহূর্ত্তে সে নিজেকে এত ছোট করিয়া তুলিতেছে কেন? বাহিরের মিথ্যা মুখোস্‌খানা বাদ দিয়া ইহাই যদি তাহার সত্যকার রূপ হয়, তাহা 'হইলে ভবিষ্যতে সে কি লইয়া বাঁচিবে?

অরুণ কবে কাহার নিকট হইতে কেমন করিয়া না জানি ইন্দ্র-নাথের কার্য্যকলাপ জানিতে পারিয়াছিল—এই হইল বিবাদের সূত্রপাত! সে কথা সে কোন দিন উত্থাপন করে নাই, এত দিন যাহা কিছু হইত, নিখিলকে লইয়াই। আজিও সন্ধ্যা রাত্রি হইতে নিখিল সম্বন্ধে অরুণ অপ্রিয় কোন প্রশ্নের অবতারণা করিল না দেখিয়া অসিতা মনে-মনে বেশ খুসী হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু হঠাৎ মধ্য রাত্রে ঘুম ভাঙাইয়া যে সে এমন করিবে, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই!

ঝগড়া হইতে হইতে হঠাৎ অরুণ বলিয়া উঠিল, তোমাদের গুণের কথা তোমার বাবা সবই জানেন।

অসিতা কিছুই বুঝিতে পারিল না, মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, কি বললে?

তোমার বাবার কথা বল্‌ছি।

অসিতা একটুখানি বিমর্ষ হইয়া পড়িল। বলিল, আমি জানি না।

কচি খুকি ত' নও। আমার কাছে সাধু সাজ্‌লে 'চল্‌বে কেন? তোমাদের গুণ তিনি জানেন বলেই তোমাদের কাছ থেকে তিনি সরে গেছেন।

অসিতা বলিল, কি গুণ শুনি?

অরুণ বিরক্ত হইয়া জবাব দিল, কিছু না, তুমি ঘুমোও।

অসিতা কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল।

অরুণ আবার বলিল, তোমার মত ত্রিশ বছরের এই ন্যাকা মেয়েকে কি কেউ বিয়ে করতো না কি? নিখিলটা খুব বন্ধুর কাজ করলে যা-হোক!

বন্ধুর কাজ তুমিই বা করলে কেন? না করলেই তো হতো।

হতভাগা যে তখন ভুলিয়ে দিলে। বল্‌লে, শ্বশুর বড় লোক, প্র্যাক্‌টিস্‌ করবার সময় মেলা টাকা পাবি, তার উপর তোমার মত রূপবতী গুণবতী ভার্য্যা……

অসিতা বলিল, এখন বুঝি দেখ্‌ছো—সব মিথ্যা।

হ্যাঁ। আমার না করাই উচিত ছিল।

ব্যাপারটাকে তরল করিয়া দিবার জন্য অসিতা বলিল, আহা! তাহ'লে বল, তোমার বড় দুঃখু হয়েছে? এখন তো আর ফিরিয়ে দিতে পারবে না...